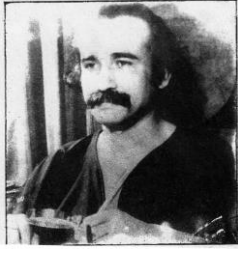


চেতনা
অতিচেতনা
নিরাময় ও প্রশান্তি

মহাজাতক



মা-বাবাকে



মহাজাতক শহীদ আল বোখারী

বরেণ্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাজাতক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, মহাশূন্যযান চ্যালেঞ্জারের দুর্ঘটনা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, নব্বই-এ বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা, পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভরাডুবিসহ অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান, যোগ, মেডিটেশন, প্রাকৃতিক নিরাময় তথা অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এই বিষয়গুলোর উপর তিনি লিখে আসছেন গত দুই যুগ ধরে। দৈনিক ইন্ডেফাকে নিয়মিত রাশিফল ও বর্ষ শুরুতে ভবিষ্যদ্বাণী লিখে আসছেন ১৯৭৭ সাল থেকে।

শহীদ আল বোখারী কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। সাইকিক কনসালটেন্ট হিসেবে সার্বক্ষণিক কাজ শুরু করার আগে তিনি ছিলেন দেশের প্রাচীনতম দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক। জ্যোতিষ বিজ্ঞানের পাশাপাশি যোগ ও মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ১৯৮৩ সালে স্থাপন করেন যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র। পরে এই প্রচেষ্টাকে আরো সজ্জ্বত করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন যোগ ফাউন্ডেশন। তিনি মেডিটেশন ও মননীয়ন্ত্রণের সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 'কোয়ান্টাম মেথড' এর উদ্ভাবক ও সফল প্রশিক্ষক।

চেতনা, অতিচেতনা, নিরাময় ও প্রশান্তি একগুচ্ছ আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় নিবন্ধের সংকলন।

চেতনা
অতিচেতনা
নিরাময় ও প্রশান্তি

মহাজাতক



প্রজাপতি প্রকাশন



প্রকাশক

কাজী শাহনূর হোসেন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ

১৯৯৩

প্রচ্ছদ

শুভাশীষ মজুমদার

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

যোগাযোগ

প্রজাপতি প্রকাশন

[সেবা প্রকালনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরলাপন: ৮৩১ ৪১৮৪

মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Chetona, Otichetona, Niramoy O Prosanti

By: Mahajataq

ISBN-984-462-905-5

মূল্য: একশত চল্লিশ টাকা

সূচিপত্র

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ৭

টেলিপ্যাথি ১৭

টেলিপ্যাথি : মার্ক টোয়েনের অভিজ্ঞতা ২৬

বায়োরিদম : আপনার জীবনছন্দ ৩৫

চিকিৎসার নবদিগন্ত : চুম্বক তরঙ্গ ৪২

আঙ্গুলের পরশে ব্যথা নিরাময় ৫১

দম নিয়ন্ত্রণ : প্রাণবন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ৭১

মেডিটেশন-এর শক্তি ৮০

রোগ নিরাময়ে মেডিটেশন ৯১

শিথিলায়ন : মনের বাড়ি ৯৬

গাছ কথা বলে! ১০৪

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয় ১১৮

আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ১২৯

আই চিং ১৩৫

অধ্যায়-১

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা

গোল...গোল...ঘোরে...ঘোরে...চাকা...চাকা...দুই চাকা...দুই চাকা...সাইকেল... সাইকেল। মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে পানিভর্তি একটি কাঁচের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বরিশালের রশিদ ফকির ওরফে রইস্যা ফকির ধীরে ধীরে ডুব দিচ্ছিলেন এক অজানা রহস্যে। খুব অল্প সময়েই রহস্যজাল ভেদ করলেন তিনি। শেরে বাংলার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও একান্ত সচিব জনাব এস. এম আজিজুল হকের হারিয়ে যাওয়া সাইকেল কোথায় আছে, কীভাবে আছে তা নির্ভুলভাবে বলে দিলেন তিনি। জনাব আজিজুল হকও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন বর্ণনার নির্ভুলতায়। নিজের জীবনের বিস্ময়কর কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে প্রায় দেড় যুগ আগে তিনি ঘটনাটি আমার কাছে বলেন।

আমিও সেদিন বিস্মিত কম হইনি। অনুভব করেছি এক অদম্য কৌতূহল। এ কী করে সম্ভব। আমরাও কি এভাবে অজানা রহস্য উদঘাটন করতে পারি না? পারলে কীভাবে? একদিন বা এক বছরে এ প্রশ্নের জবাব পাই নি। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়েছে এ রহস্য। স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মায়াজাল। একসময় প্রবেশ করেছি কৃস্টাল বল বা শুভ্র-স্বচ্ছ গোলকের জগতে। এই কৃস্টাল বলই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রথম স্তর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি লাভের মাধ্যম। অকাল্ট সাধকদের ন্যায় আপনিও অনায়াসে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি লাভ করতে পারেন। কারণ কৃস্টাল বল ব্যবহার পদ্ধতি মোটামুটি সহজ।

প্রথমে একটা কৃস্টাল বল জোগাড় করুন। এটি শুভ্র-স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলক হতে পারে, হতে পারে খনিজ কাঁচের গোলক। তা পাওয়া না গেলে সাধারণ কাঁচের গোলকেও কাজ চলতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে গোলকের মধ্যে যেন কোনো দাগ বা খুঁত না থাকে। গোলকের অভাবে আপনি কাঁচের পেয়ালা ব্যবহার করতে পারেন। পেয়ালায় যেন কোনো নকশা বা দাগ না থাকে। পেয়ালায় পানি ভরে নিন। আর তা রাখুন কালো সিল্ক বা মখমলের কাপড়ের ওপর।

আপনি সকালে বা সন্ধ্যায় যে-কোনো সময় বসতে পারেন। যে ঘরে বসবেন, সেখানে যেন কোলাহল না থাকে। বাইরের হৈ-হল্লা যেন সেখানে প্রবেশ না করে। আর আলোর ছটা যেন সরাসরি কৃস্টাল বলে না পড়ে। আর যদি রাতে বসেন তবে মৃদু আলোকে ঘরটাকে আলোকিত করে নিন। তবে লক্ষ রাখুন যেন সরাসরি বাতির আলো কৃস্টাল বলে প্রতিফলিত না হয়।

নিরাময় ও প্রশান্তি

এবার নিজে বসুন। পদ্মাসনে বসাই সবচেয়ে ভালো। পদ্মাসনে বসতে না পারলেও আপত্তি নেই। যেভাবে আরাম পান সেভাবেই বসুন। স্নায়ু, মাংসপেশী বা রগে যেন টান না পড়ে, তেমন চাপ না পড়ে। কারণ বসে আরাম না পেলে অথবা অস্বস্তি বোধ করলে আপনার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটবে।

আপনি বসেছেন। আরাম করে বসেছেন। এবার দু'হাতের তালুর ওপর কৃষ্টিাল বলখানা নিন। কৃষ্টিাল বলের দিকে তাকান। বলের ওপর নয়, একেবারে বলের ভেতর। আপনার মন থেকে সমস্ত চিন্তাভাবনা মুছে ফেলুন। একদম কিছু ভাববেন না। দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন বলের কেন্দ্রস্থলে। ধীরে ধীরে আপনি প্রবেশ করবেন অতীন্দ্রিয়ের জগতে। আপনার তখন মনে হতে পারে কৃষ্টিাল বলের আয়তন বাড়ছে। একটা বিন্দুসম মেঘপুঞ্জ যেন সকল দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আপনি যেন সেই শূন্যে উঠে যাচ্ছেন। আর সেই মুহূর্তে একটা ঝাঁকি খাবেন আপনি। আপনি ফিরে আসবেন আপনার পূর্বতন জগতে।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল তিব্বতীয় সাধক লামা লবসাঙ রাম্পার জীবনে।

'ডক্টর ফ্রম লাসা, গ্রন্থে লামা রাম্পা লিখেছেন : 'আমি কৃষ্টিাল বলে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলাম, মন তখন একদম ফাঁকা। হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, আমার হাতের তালুতে রাখা গোলকের আয়তন বাড়ছে। আমার মনে হলো, আমি এর ভেতরে পড়ে যাব। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। সমস্ত অনুভব বিলীন হয়ে গেল। দেখলাম হাতে একটা স্বচ্ছ গোলাক ছাড়া আর কিছু নেই।

রহস্যময় তিব্বতেই সাধকরা কৃষ্টিাল বল ব্যবহার করতেন না। অতীন্দ্রিয় সাধকরা সর্বকালেই কোনো না কোনোভাবে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসেছেন।

ব্যাবিলনে উজ্জ্বল ধাতব পেয়ালায় পানি ভরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সাধকরা পৌঁছতেন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির জগতে।

জেনেসিসে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ইউসুফ রূপার পেয়ালায় পানি ভরে তা এজন্যে ব্যবহার করতেন।

গ্রীকরা উজ্জ্বল ধাতব পেয়ালায় পানি ভরে তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন।

গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস কৃষ্টিালের পরিবর্তে ব্যবহার করতেন আয়না। তার মতে চন্দ্রলোকে আয়নায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ।

গ্রীক অকাল্টবিদরা অনেক সময়ই স্বচ্ছ বার্নার পানিতে আয়না নামিয়ে দিতেন রোগীর অবস্থা জানার জন্যে ।

প্রাচীন মিসরীয় অকাল্ট সাধকরা দিব্যদৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করতেন আয়না । আরব সাধকরা আয়নার সাথে সাথে ব্যবহার করতেন রূপালি পেয়ালাভর্তি পানি ।

ভারত, চীন ও আফ্রিকায়ও প্রাচীন সাধকরা রূপা বা কাঁসার পাত্রে পানি ব্যবহার করে কৃষ্টিালের কাজ চালাতেন ।

অতীন্দ্রিয় সাধকদের মধ্যে আমেরিকার মায়া সভ্যতায়ই প্রথম মসৃণ কৃষ্টিাল ব্যবহার হয় । অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাও মসৃণ কোয়ার্জ-খণ্ড ব্যবহার করতেন ।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নন্দ্রোডামাস ব্যবহার করতেন কৃষ্ণ আয়না । একদিন তিনি ফ্র্যান্সের তদানীন্তন রাণীকে সে আয়নায় দেখান ভবিষ্যৎ রাজার মুখ ।

রাণী প্রথম এলিজাবেথের ব্যক্তিগত এস্ট্রলজার ড. জন ডি-এর রহস্যময় কৃষ্টিালই প্রথম ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে ।

আর বর্তমান শতকে আমেরিকান ভবিষ্যতদ্রষ্টা জীন ডিক্সনের কৃষ্টিালের কথা তো সবারই জানা ।

আবার আমাদের সাধনার কথায় আসা যাক । সম্ভবত আপনি প্রথম বৈঠকে কৃষ্টিালের শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এসেছেন । যদি তাই হয়, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান । আপনার অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ক্ষমতা অসাধারণ । উত্তরণের সাঁকো পার হয়ে দ্রুত আপনি সাফল্যের পথে পৌঁছতে পারবেন ।



আবার এ-ও হতে পারে, প্রথমবার বসে কৃস্টালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও আপনি কোনো অনুভবের স্তরে পৌঁছতে পারলেন না। মনকে করতে পারলেন না ভাবনা-শূন্য। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হতে লাগল বার বার। নিজের ওপরই হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, কিচ্ছু হবে না আপনাকে দিয়ে। কিন্তু আপনার হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিশ্বাস করুন। ধৈর্য ধরুন। কৃস্টাল বলের মাধ্যমে আপনি অতীন্দ্রিয়ের জগতে প্রবেশ করবেনই।

প্রথমবারে যখন হলো না, এবার আপনি আরেকটু ধীরে অগ্রসর হোন।

একটি সপ্তাহ আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন। যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন। কারো ওপর রাগ করবেন না। কাউকে বকবেন না। মাছ, গোশত ও তেলে-ভাজা দ্রব্য না খেয়ে থাকতে পারলে খাবেন না। নিরামিষ খাদ্য খান। প্রচুর ফলমূল ও দুধ খান। প্রতিদিন সকালে এক চামচ মধু ও চারটা খেজুর খান।

কৃস্টাল বলটাকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আপনার ব্যক্তিগত চুম্বকশক্তির অংশবিশেষ স্থানান্তরিত হবে কৃস্টালে। কৃস্টালের অনুভবের সাথে আপনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠবেন একাত্ম।

এছাড়া রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কৃস্টালটা আপনার বালিশের নিচে রাখুন। এতে নিবিড়তা বাড়বে আরো। আপনি যখন নাড়াচাড়া করছেন না, তখন কৃস্টাল বলকে কালো সিল্ক বা মখমলের কাপড়ে ঢেকে রাখুন। খেয়াল রাখবেন, কৃস্টালে যেন সরাসরি সূর্যের রশ্মি না পড়ে। কৃস্টালটিকে নিরাপদ জায়গায় রাখবেন, যেন অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে না পারে।

সাতদিনে কৃস্টালের সাথে আপনার মোটামুটি একটা সখ্যতা গড়ে উঠবে। এরপর আপনি আবার নীরব ঘরে গিয়ে বসুন। বসার পর যেন কোনো ধরনের শারীরিক অস্বস্তি না থাকে। দুই হাতের তালুতে কৃস্টাল বলটি নিন। লক্ষ রাখুন- সূর্যের আলো বা বাতির আলো যেন সরাসরি কৃস্টালের গায়ে না পড়ে।

দরকার মনে করলে স্থান বা আসন পরিবর্তন করে নিন। আপনি কৃস্টাল সাধনায় বসার সময় মাদুরের ওপর কালো কাপড় বিছিয়ে নেবেন। এ কাপড় ও মাদুর অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করবেন না।

আপনি আবার বসেছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আপনি ভাবুন আল্লাহর কথা। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নীলিমার গভীরতা ও বিশালত্বের কথা।

এ ভাবনা মুহূর্তের জন্যে। এবার আস্তে করে কৃস্টাল বলটি কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কপালের মাঝখানে ঠেকান। আস্তে আস্তে কৃস্টালসহ হাত নামিয়ে নিন। তালুতে কৃস্টাল রেখে হাত হাঁটুর ওপর আরাম করে রাখুন।

এবার কৃস্টালের ওপর প্রথম অলস দৃষ্টি বুলিয়ে যান। আস্তে আস্তে দৃষ্টিকে কৃস্টালের কেন্দ্রে নিয়ে যান। দৃষ্টিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ করুন। ভাবুন, আপনি এক অস্তিত্বহীন শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনকে চিন্তা ও ভাবনাশূন্য করে ফেলুন। কোনো কিছু দেখতে বা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবেন না। কোনো গভীর আবেগ-অনুভূতির প্রশ্রয় দেবেন না।

প্রথম রাতের জন্যে ৭ মিনিট সময়ই যথেষ্ট। আস্তে আস্তে কৃস্টালের কেন্দ্রে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় বাড়ান। এমন অনুপাতে সময় বাড়ান যেন আপনি সপ্তাহের শেষ দিনে ২৫ মিনিট পর্যন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারেন।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এবার বসার সাথে সাথে মনকে চিন্তাশূন্য করে ফেলুন। কৃস্টালের মধ্যে অন্তর্হীন শূন্যতার কল্পনা করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। আস্তে আস্তে মনে হবে কৃস্টালের উপরিভাগ চেউয়ের মত দুলছে। মনে হবে, পুরো গোলক বেলুনের মত বাড়ছে। মনে হবে, আপনি যেন গোলকের শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন বা পড়ে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, তাই হবে।

এতে বিস্মিত হবেন না। ভয়ে কেঁপে উঠবেন না। আপনার বিস্ময়, আপনার ভয় সবকিছুকে মুহূর্তে বিলীন করে দেবে। সে রাতে আপনি আর কিছুই দেখতে পাবেন না। যদি আপনি ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠেন বা তন্দ্রামগ্ন মানুষের মতো বাঁকি খান, তবে সে রাতে পুরোপুরি বিশ্রাম নিন। সেদিন আর কৃস্টালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না।

পরের দিন আবার আগের মতো কৃস্টালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

এভাবে আপনি কৃস্টালে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

দেখবেন বসার পর মন চিন্তাশূন্য করার সাথে সাথে মনে হবে কৃস্টালের আয়তন বাড়ছে। মনে হবে তাতে প্রাণ এসেছে। আর তা ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে।

সাধারণভাবে ৪০ দিনের মাথায় আপনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরই মনে হবে কৃস্টাল যেন শ্বেতশুভ্র ধূসকুণ্ডে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আপনি কেঁপে না উঠলে আস্তে আস্তে সাদা ধোঁয়া সরে যাবে। আপনি গোলকের শূন্যতায় হয়তো দেখবেন নিজের জীবনের কোনো ঘটনা।

প্রথমদিকে সাধারণত অতীতের ঘটনাই ভেসে ওঠে। আপনি তখন প্রবেশাধিকার পেলেন অকাল্টের সীমানায়।

আপনি চর্চা অব্যাহত রাখুন। প্রতিদিন একের পর এক নিজের বিষয় দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। তখন আপনি ইচ্ছানুসারেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন দৃশ্যাবলি।

এরপর আপনি পছন্দমাত্রিক বিষয় দেখতে চেষ্টা করুন। দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সাথে নিজে নিজে বলুন, 'আজকে আমি এই জিনিস দেখব।

বিশ্বাস করুন তখন আপনি যা দেখতে চাইবেন, তা-ই দেখতে পাবেন। আপনার দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাই হবে শেষ কথা। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহ করুন। কৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। দৃঢ়তার সাথে মনে মনে বলুন 'আমি এই এই বিষয় জানতে চাই।, কৃষ্টির ওপর আপনার এখন একটা কমান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার কি আপনি অন্য কারো সম্পর্কে কিছু জানতে চান?

কালো একটা কাপড়ে ধরে কৃষ্টিতে বহমান পানি বা ট্যাপের পানিতে ধুয়ে ফেলুন। হাত দিয়ে স্পর্শ না করে সতর্কতার সাথে একে শুকিয়ে নিন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির হাতে কৃষ্টিতে দিন।

দুঃহাতের তালুতে কৃষ্টিতে নিয়ে সে যা জানতে চায় সে সম্পর্কে তাকে ভাবতে বলুন। তারপর তার হাত থেকে কৃষ্টিতে নিজের হাতে নিন।

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যেন এরপর কোনো কথা না বলে বা কোনোভাবে আপনার মনোযোগে বিঘ্ন না ঘটায়।

প্রশ্নকারীর হাত থেকে আপনার হাতে কৃষ্টিতে নিয়েছেন। এবার আরাম করে বসুন। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কৃষ্টিতে কপালের সাথে হালকাভাবে ঠেকান। হাতের তালুতে কৃষ্টিতে রেখে হাত হাঁটু বা পায়ের ওপর রাখুন। কৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। মন থেকে চিন্তা-ভাবনা দূর করে ফেলুন। মনটাকে একদম ফাঁকা করে দিন। অবশ্য আপনি যেহেতু আত্ম-সচেতন তাই প্রথম উদ্যোগে মনটাকে একেবারে ফাঁকা করা কষ্টকর হতে পারে।

মনটাকে ফাঁকা সমাহিত করতে পারলে আপনি আবার অকাল্টের সীমানায় প্রবেশ করবেন। হয় আপনি স্পষ্ট সব ছবি দেখতে পাবেন অথবা কিছু প্রতীকী ছবি ভেসে আসবে অথবা কিছু অনুভূতি আপনাকে আচ্ছন্ন করবে।

আপনার লক্ষ্য হবে স্পষ্ট ছবি দেখা। আর চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আপনি তা পারবেন।

প্রথমে আপনি দেখবেন শুভ মেঘপুঞ্জ। তারপর ভেসে আসবে ছবি। যা জানতে চাচ্ছেন তার সুস্পষ্ট ছবি। এ ছবির ব্যাখ্যা প্রশ্নকারীকে জানানো কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

অবশ্য কারো কারো পক্ষে যথার্থ ছবি দেখা সম্ভব নাও হতে পারে। তারা হয়তো কিছু প্রতীকের চেয়ে স্পষ্ট কিছু দেখতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

আপনি যদি প্রতীকের চেয়ে বেশি কিছু দেখতে সক্ষম না হন, তাতেও হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। প্রতীকেই প্রশ্নের জবাব পাবেন। আর কোনো প্রতীক ব্যাখ্যা করা আপনার জন্যে কঠিন কিছু হবে না।

যেমন ধরুন আপনি দেখলেন :

-মেঘপুঞ্জ উড়ছে : প্রশ্নকারীর প্রশ্নের হাঁ-সূচক জবাব।

-মেঘপুঞ্জ নামছে : প্রশ্নকারীর প্রশ্নের না-সূচক জবাব।

-শ্বেতশুভ্র মেঘপুঞ্জ : শুভ লক্ষণ। সাধারণ সৌভাগ্যের ইঙ্গিত।

-সবুজ, নীল ও বেগুনি মেঘপুঞ্জ : শুভ লক্ষণ। সুখের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

-হলুদ, কমলা ও লাল মেঘপুঞ্জ : অশান্তি, বিপদ, দুঃখ ও ক্ষতির সম্ভাবনা।

-পাখি : কোনো খবর আসছে।

-নোঙর : নিরাপত্তার প্রতীক।

-ঘণ্টা বাজছে : বিয়ে বা কোনো কর্তব্যের ডাক আসছে।

-মুকুট : ক্ষমতা ও খ্যাতি।

-ডিম : সাফল্য ও সুখ।

-ফুল : সৃজনশীল সম্ভাবনা।

নিরাময় ও প্রশান্তি

-ফল : শিশু জন্ম নেবে। শুভ লক্ষণ।

-মানচিত্র : ভ্রমণের নির্দেশক।

-পান : প্রেমে শুভ অগ্রগতির লক্ষণ।

-মানুষের মুখ : দর্শনার্থীর আগমন, পরিবর্তন বা গোলযোগের প্রতীক।

-চাবি : আর্থিক সাফল্যের লক্ষণ।

-বাতিঘর : কষ্ট আসছে, কিন্তু আশার আলোও আছে।

-মুখোশ : প্রতারণা, শত্রুতার সম্ভাবনা।

-খুলি : এটি কারো মৃত্যুর আশঙ্কার প্রতীক হলেও, তা সবসময়ই অশুভ নয়। এটি বিশেষ উপলব্ধি ক্ষমতারও ইঙ্গিত।

-সাপ : সুস্বাস্থ্য, রোগমুক্তি ও জ্ঞানের প্রতীক।

-নক্ষত্র : আশা পূরণ হবে, কিন্তু কিছু আশঙ্কাও থাকবে।

-তরবারি বা অস্ত্র : বিরোধিতা, কষ্ট ও শত্রুতার প্রতীক।

কৃস্টাল বল নিয়ে চর্চা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কোন্ প্রতীকের কি অর্থ।

তৃতীয়ত- কৃস্টাল থেকে আপনি কিছু অনুভূতি পেতে পারেন। এতে আপনি উজ্জ্বল মেঘপুঞ্জ ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেন না। কিন্তু মনের মধ্যে আপনি সুনির্দিষ্ট ইম্প্রেশন বা ছাপ অনুভব করবেন।

তবে কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। কৃস্টাল থেকে প্রাপ্ত অনুভূতির কথাই ব্যক্ত করবেন।

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর কৃস্টাল বলটি কালো কাপড়ে সযত্নে জড়িয়ে রাখুন। প্রশ্নকারী চলে যাওয়ার পর কৃস্টালটি প্রথমে পানিতে ডুবিয়ে তারপর পানি ঢেলে ভালোভাবে ধুয়ে কাপড়ে মুছে ফেলুন।

কৃস্টালটি আপনার হাতের তালুতে কিছুক্ষণ রাখুন। তাহলে তা পুনরায় আপনার দৈহিক চুম্বক-শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনুকূল বলয়ে অবস্থান করবে।

আপনি যত নাড়াচাড়া করবেন, ততই ভাল। তবে কৃস্টালে কখনই আঁচড় কাটবেন না। নাড়াচাড়া শেষ হলে কালো সিল্কে মুড়ে তা বাক্সে তালাবদ্ধ করে রাখুন। যেন অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে না পারে।

যতবার আপনি কৃস্টাল প্রশ্নকারীর হাতে দেবেন ততবারেই প্রশ্নকারী চলে যাওয়ার পর আপনাকে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে।

আপনাকে যে-কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। আপনি এমন কিছু বলবেন না, যা প্রশ্নকারীর ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সত্যিকারের সাধক কখনো কারো মৃত্যুর সময় বা আশঙ্কা সম্পর্কে কিছু বলেন না। আপনিও হয়তো বুঝতে পারবেন, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে কখনো কিছু বলবেন না।

রোগ-ব্যাধি সম্পর্কেও সুনিশ্চিত করে কিছু বলবেন না। বরং আপনি বলবেন, অমুক অমুক সময়ে শরীরের প্রতি বেশি যত্ন নেবেন।

কাউকে তাঁর স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে- এমন কিছু বলবেন না। স্ত্রী বা স্বামীর সব কর্মকাণ্ডই হয়তো আপনার কৃস্টালে ধরা পড়বে, কিন্তু সাবধান এমন কিছু বলবেন না, যা কোনো ঘরে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে বা ঘর ভেঙে দিতে পারে।

শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণে কৃস্টাল ব্যবহার করুন, আপনারও তাতে কল্যাণ হবে। আর যদি আপনি কিছুই দেখতে না পান, প্রশ্নকারীর কাছে সবিনয়ে বলুন- আমি কিছু দেখতে বা উপলব্ধি করতে পারলাম না। এই সরল স্বীকারোক্তির জন্যে প্রশ্নকারী আপনাকে শ্রদ্ধা করবে।

আপনি হয়তো কিছু দেখতে না পেয়েই প্রশ্নকারীকে কিছু বললেন। হয়তো আপনি এমন কিছু বললেন, প্রশ্নকারী জানে যে তা ভুল। বুঝতেই পারেন, তেমন হলে আপনার সম্মান ও সুনাম দুই-ই যাবে।

সর্বশেষে আপনাকে সাবধান করে দেয়া প্রয়োজন- অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা যেমন সম্ভাবনাময় তেমনি তা বিপজ্জনকও। কৃস্টাল বল স্পর্শ করার আগে চিন্তা করে দেখুন, আপনার নিয়ত বা উদ্দেশ্য মানবের কল্যাণ-অভিসারী কি না।

কোনো পার্থিব স্বার্থ বা লোভ-লালসা আপনাকে অনুপ্রাণিত করছে কি না। জুয়া-লটারির ফলাফল আর প্রাইজবন্ডের ড্রর প্রতি আগ্রহ আপনাকে কৃস্টাল স্পর্শে উদ্বুদ্ধ করছে কি না। অন্য কারো ক্ষতি করার ইচ্ছা মনের গহীনে আছে কিনা।

যদি তেমন কিছু থাকে, তবে এই নিবন্ধ পড়েই ক্ষান্ত হোন। অতীন্দ্রিয় সাধনার প্রক্রিয়ায় পা বাড়াবেন না। কারণ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা হচ্ছে দু'ধারি অস্ত্র।

এর মাধ্যমে অন্যের সাহায্য করে আপনি অনন্ত আনন্দে অবগাহন করতে পারেন। আবার ভয়াবহ ভীতিপ্রদ কিছুতেই ভোলা যায় না- এমন দৃশ্যাবলিও ভেসে উঠতে পারে কৃস্টালের শ্বেতশুভ্র মেঘপুঞ্জে।

কৃস্টাল ব্যবহার করে কারো ক্ষতি করলে সবটাই বুমেরাং হয়ে আপনার ওপর নিপতিত হবে অমোঘ অতীন্দ্রিয় আইন অনুসারে। আপনার অনেক ক্ষতি হতে পারে।

মানসিক বা স্নায়বিক বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতা দ্বারা আপনাকে শাস্তি দেয়া হতে পারে। মহাকালের মতই অতীন্দ্রিয় শাস্তি অত্যন্ত নির্মম। আর আপনার নিয়ত সম্পর্কে নিশ্চিত হলে আপনি নীরব পদচারণায় এগিয়ে যান।

প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন কৃস্টাল স্পর্শ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কাউকে কৃস্টাল দেখালে তখনই কৃস্টালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু অবলোকনের চেষ্টা করুন। কৃস্টাল 'পাঠ' করুন। আপনি কী করছেন বা কী দেখলেন তা যাকে কৃস্টাল দেখালেন তাকে বলার দরকার নেই।

আর অকারণে কাউকে কৃস্টাল দেখাবেন না। এমন কি বন্ধুদেরও না। দেখালেই আপনাকে কৃস্টাল 'পাঠ' করতে হবে। এটা কোনো কুসংস্কার নয়। এটা কৃস্টাল ট্রেনিং-এর অংশ। এই প্রক্রিয়ায় নিজেকে গড়ে তুললে কৃস্টালের কালো আবরণ উন্মোচনের সাথে সাথেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে দেখতে পাবেন। এজন্যে কোনো চিন্তা বা প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে না।

(সাপ্তাহিক রোববার, ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায়-২

টেলিপ্যাথি

একবিংশ শতকের যোগাযোগ মাধ্যম কী হবে? এককথায় এর জবাব দেয়া কঠিন? আদিকাল দূরে অবস্থিত প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ করতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তারপর দূরত্ব অতিক্রমের জন্যে ব্যবহৃত হতে লাগল পশু। এরপর এলো যন্ত্রযুগ। প্রচলন হলো ডাক ব্যবস্থা। আবিষ্কৃত হলো টেলিগ্রাফ। উদ্ভাবিত হলো টেলিফোন। এরপর সর্বশেষে চমক সৃষ্টি করল বেতার যোগাযোগ।

বেতার যোগাযোগ পৃথিবীর দূরত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। সভ্যতার যে-কোনো প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে।

কিন্তু বেতার তরঙ্গের ব্যবহারেও বিপত্তি ঘটতে পারে। যেমন- খারাপ আবহাওয়ায় বেতার যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়লে বেতার তরঙ্গও ঘুরাপাক খেতে থাকে। তাছাড়া বেতার তরঙ্গ সমুদ্রে মাত্র কয়েকশ, গজের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

বেতার তরঙ্গের এই সীমাবদ্ধতার কারণে বিজ্ঞানীরাও আজ বিকল্প এবং আরো কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবনে নিমগ্ন। এই প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানীদের আজ দৃষ্টি পড়েছে একদা আধ্যাত্মিকতার রহস্যময় গুণ্ডির মাঝে সীমাবদ্ধ টেলিপ্যাথির ওপর।

অবশ্য টেলিপ্যাথির সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ আজকে নতুন নয়। বিজ্ঞানীদের সজ্জবদ্ধ দৃষ্টি সর্বপ্রথম এ দিকে আকৃষ্ট হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে। ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডের ডাবলিনস্থ রয়েল কলেজ অব সায়েন্সের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম ব্যারেট টেলিপ্যাথি বা চিন্তা স্থানান্তরণ সম্পর্কিত তাঁর গবেষণার প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন।

সম্মেলনে টেলিপ্যাথি এবং এক্সট্রা-সেনসরি পারসেপশন (সংক্ষেপে ইএসপি) সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্যে গঠিত হয় সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ। সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন স্যার হেনরি সিজউইক। ইলেক্ট্রন-এর আবিষ্কর্তা অধ্যাপক জে জে থমসন, স্যার উইলিয়াম ব্রুক্স, লর্ড রেইলে, লর্ড বেলফোর, হেনরি বার্গসন, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, স্যার অলিভার লজ প্রমুখ এসময় টেলিপ্যাথির সজ্জবদ্ধ গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী স্যার অলিভার লজ টেলিপ্যাথি গবেষণায় প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

কতিপয় প্রাথমিক উদ্যোগের ব্যর্থতার পর তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত টেলিপ্যাথির মাধ্যমে রেখাচিত্র স্থানান্তরণের প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য লাভ করে।

সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের কার্যবিবরণীতে একে 'গাথরী এক্সপেরিমেন্ট, বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিভারপুলের এক স্কুলশিক্ষক মি. ম্যালকম গাথরী এই গবেষণায় চিন্তা প্রেরণকারীর ভূমিকা পালন করেন। মি. গাথরী, স্যার অলিভার লজের আঁকা রেখাচিত্রে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতেন।

মি. গাথরীর মস্তিষ্ক থেকে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে রেখাচিত্রের ধারণা স্থানান্তরিত হতো অপর স্থানে অবস্থিত এক মহিলার মস্তিষ্কে। তিনি এভাবে প্রাপ্ত ধারণা থেকেই রেখাচিত্রের প্রতিলিপি আঁকতেন।

গাথরী এক্সপেরিমেন্টের সাফল্যে ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকায়ও টেলিপ্যাথি এবং ইএসপি সম্পর্কে গবেষণার জন্যে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকায় এ সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন অমর কথাশিল্পী মার্ক টোয়েন এবং উইলিয়াম জেমস।

আমেরিকায় টেলিপ্যাথি গবেষণায় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ১৯৩৯ সালে।

নিউইয়র্কের সেভিংস ব্যাংক জার্নালের সম্পাদক হ্যারল্ড শেরম্যান প্রথম দূরপাল্লায় টেলিপ্যাথি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করেন উত্তর মেরু অভিযাত্রী স্যার হুভার্ট উইলকিন্সের সাথে।

উত্তর মেরু অভিযানকালে স্যার হুভার্ট উইলকিন্সের সঙ্গে নিউইয়র্কে অবস্থানকারী হ্যারল্ড শেরম্যানের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের প্রথম বিবরণ প্রকাশিত হয় কসমোপলিটন ম্যাগাজিনের ১৯৩৯ সালের মার্চ সংখ্যায়।

স্যার উইলকিন্স এবং হ্যারল্ড শেরম্যান যথাক্রমে প্রেরক এবং গ্রহণকারী হিসেবে তাদের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন 'থট থ্রো স্পেস, গ্রন্থে।

উইলকিন্স ও শেরম্যানের মধ্যে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতার যোগাযোগের চাইতেও সফল প্রমাণিত হয়।

উত্তর মেরু অভিযানের এক পর্যায় স্যার উইলকিন্স তার পূর্ববর্তী নিখোঁজ রাশিয়ান অভিযাত্রীদের খুঁজে বের করার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এমনি ব্যস্ত সময়ে শেরম্যান একদিন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রধান রেডিও অপারেটরকে জানান যে, উইলকিন্স আজ বিকেলে আনুষ্ঠানিক সাক্ষ্যকালীন পোশাক পরিধান করেছেন। রেডিও অপারেটর কথাটিকে হেসেই উড়িয়ে দেন। অবশ্য উইলকিন্সের তখনকার অবস্থায় তেমন ঘটনা ছিল অসম্ভব।

পরে জানা যায় যে, বিমানের একটি যন্ত্রাংশ ঠিকভাবে কাজ না করায় মেরামতের জন্যে তিনি সেদিন কানাডার উত্তরাঞ্চলীয় একটি ক্ষুদ্র শহরে অবতরণ করেন। সেখানে গণ্যমান্য নাগরিকদের অনুরোধে শহরের বার্ষিক ভোজসভায় অংশগ্রহণে তিনি বাধ্য হন। আর সে ভোজসভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন সাক্ষ্যকালীন আনুষ্ঠানিক পোশাকে।

কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রধান রেডিও অপারেটর উইলকিন্সের কাছ থেকে কোনো সংবাদ পান নি।

অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামনস্তত্ত্ব বা প্যারাসাইকোলজির একনিষ্ঠ সাধক হচ্ছেন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জে বি রাইন। ১৯২২ সাল থেকে ডক্টর রাইন টেলিপ্যাথি আর পরামনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। তিনি প্রথম টেলিপ্যাথির সামরিক প্রয়োগের সম্ভাব্যতার ওপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ডক্টর রাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রিসার্চ অফ দি মাইন্ড,-এ লিখেছেন- নিয়ন্ত্রিত ও নির্ভরযোগ্য টেলিপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্স (কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) সামরিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তা বোমাকেও অকেজো করতে পারে।

টেলিপ্যাথি ও ক্লেয়ারভয়েন্স-এর মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থানে অবস্থিত যুদ্ধবিমানকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে এবং যে কোনো রণকৌশল ফাঁস করা যেতে পারে। তখন প্রতিটি গুপ্ত অস্ত্র আর সংগোপন রণকৌশলের গোপনীয়তার অবসান ঘটবে।

টেলিপ্যাথি গবেষণায় নবযুগের সৃষ্টি হয় ১৯৫৯ সালে। ওই বছর ফরাসি সংবাদপত্রসমূহে এই মর্মে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূরপাল্লার টেলিপ্যাথি এবং ইএসপি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা শুরু করছে।

আর এ গবেষণা চলছে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আটলান্টিকের গভীর তলদেশে বিচরণকারী পারমাণবিক সাবমেরিন নওটিলাস-এর মধ্যে। রিপোর্টে পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, এমন কি বেতার তরঙ্গও সমুদ্রের পানির মাত্র কয়েকশ, গজ গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় গভীর সমুদ্রে ইএসপি পরীক্ষার তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহল থেকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এ ধরনের গবেষণার বিষয় অস্বীকার করা হয়। সরকারি মহল থেকে বলা হয় যে, নওটিলাস থেকে কোনো ধরনের ইএসপি পরীক্ষা পরিচালিত হয় নি।

সরকারি অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এই রিপোর্ট ইএসপি সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি পাষ্টে দেয়। সোভিয়েট এনসাইক্লোপেডিয়ায় ইএসপিকে কল্পকথা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও সরকারিভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নে ইএসপি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শুরু হয় টেলিপ্যাথি গবেষণায় রুশ-মার্কিন প্রতিযোগিতা।

১৯৭১ সালে এ্যাপোলো-১৪ এর চন্দ্রাভিযানকালে প্রকাশিত হয় টেলিপ্যাথি গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর খবর। খবরে বলা হয়, অ্যাপোলো-১৪-এর নভোচারী ক্যাপ্টেন এডগার মিচেল চন্দ্র থেকে ইএসপি সম্পর্কে রহস্যজনক গবেষণা চালিয়েছেন।

চন্দ্রযান থেকে তিনি পৃথিবীর সাথে মোট ছয়বার টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কী বাণী পাঠিয়েছেন তা কতটুকু সঠিকভাবে পৃথিবীতে গ্রহণ করা হয়েছে, তার কিছুই আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

প্রথমদিকে ধারণা করা হয়েছিল, মহাশূন্যভিযানে রুশ-মার্কিন প্রতিযোগিতার ন্যায় ইএসপির ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা চলছে। আর যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে নিজের অগ্রগতির প্রমাণ হিসেবেই অ্যাপোলো-১৪-এর মাধ্যমে ইএসপি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে একথা অস্বীকার করা হয়।

বলা হয় যে, ক্যাপ্টেন মিচেল বহুদিন থেকে ব্যক্তিগতভাবে ইএসপি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিলেন। তিনি নিজস্ব সময়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তবে সন্দেহ নেই, তথ্যটি কোনো না কোনোভাবে ফাঁস হয়ে না গেলে কেউই এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারতেন না।

তথ্যটি কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল? এক প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় যে, পৃথিবীতে তাঁর গবেষণার সহযোগী মি. ওলফ জনসনই এ তথ্য প্রকাশের জন্যে দায়ী।

জনসন একথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ জন্যে হিউস্টনই দায়ী। অপর এক রিপোর্টে বলা হয়, মিচেলের এক বন্ধু এ তথ্যটি প্রকাশ করেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণের মুখে জনসন তা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

পরীক্ষামূলক ইএসপি গবেষণায় সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের কার্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কার্ডকে বলা হয় জেনার কার্ড।

একটি বৃত্ত, একটি চতুর্ভুজ, একটি নক্ষত্র, একটি ক্রস এবং তিনটি ডেউ খেলানো রেখা- এই পাঁচ ধরনের কার্ড থাকে এতে। একটি ডেকে থাকে মোট ২৫টি কার্ড। তবে একটি ডেকে প্রত্যেক ধরনেরই চটি করে কার্ড থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

জেনার কার্ড পরীক্ষায় প্রেরক একটির পর একটি কার্ডে সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। আর তার গ্রহণকারী তা গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করেন।

জেনার কার্ড পরীক্ষার প্রেরক ও গ্রহণকারীর মধ্যে দূরত্ব ১০ গজ হতে পারে। আবার ২০০ মাইল হতে পারে।

এই দূরত্বের ব্যবধান টেলিপ্যাথিতে কোনো প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে না বলেই আজ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৯৭১ সালে অ্যাপোলো-১৪ থেকে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ প্রচেষ্টার পর ইএসপি পরীক্ষা ক্ষেত্রে সোভিয়েত-মার্কিন প্রতিযোগিতা আরো তীব্রতর হয়েছে।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জে বি রাইনের নেতৃত্বে টেলিপ্যাথি ইএসপি সম্পর্কে গবেষণার জন্যে ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট।

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এডভান্সড রিসার্চ প্রোজেকশন এজেন্সির একটি দল এই ইন্সটিটিউটে ইএসপি সম্পর্কিত গবেষণায় অংশ নিচ্ছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক নভোচারী এডগার মিচেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে ইন্সটিটিউট অব নিওটিক সায়েন্সেস। এর গবেষণার বিষয়বস্তু ইএসপি।

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এক শতাধিক কলেজে প্যারাসাইকোলজি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পাঠ্যসূচিতে।

ইএসপি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আগ্রহ কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তা আঁচ করা যায় সাম্প্রতিক এক জনমত যাচাই থেকে।

ইংল্যান্ডে নিউসায়েন্টিস্ট সাময়িকী জনমত যাচাই করে জানান যে, শতকরা ৭৫ ভাগ পাঠক ইএসপির সম্ভাব্যতায় বিশ্বাসী। উল্লেখ্য যে, নিউসায়েন্টিস্ট-এর পাঠকরা হচ্ছেন প্রধানত বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান।

টেলিপ্যাথি সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দুজন আমেরিকান গবেষক আরও নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

তারা বলছেন, মানুষের চিন্তা শুধু অপর মস্তিষ্কে ধরা দেয় না, গাছও মানুষের চিন্তাকে গ্রহণ করতে পারে। 'দি সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস, গ্রন্থে মিথ্যা নিরূপণ যন্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্লিভ ব্যাকস্টার তার গবেষণার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি লিখেছেন, আমি গাছের পাতায় আমার মিথ্যা নিরূপণ যন্ত্রের অগ্রভাগ স্থাপন করে দেখেছি- আমার চিন্তার সাথে সাথে গাছেও প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়।

নিউ জার্সির ইলেকট্রনিক বিশেষজ্ঞ পিয়ারে পল সন্ডিন উপরোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন আরো অভিনব তথ্য। তিনি তার গাছে একটি করে গোন্ডবারগেন মেশিন সংযুক্ত করে তার বান্ধবীকে নিয়ে ৭০ মাইল দূরে ছুটি কাটাতে যান।

তিনি বলেন, এত দূরত্ব সত্ত্বেও গাছ আমাদের যৌন সম্পর্কে সাড়া দিয়েছে। তিনি বলেন, যৌন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে যন্ত্রের টোন অসিলেটর সর্বাপেক্ষা বেশি ওপরে ওঠে।

সোভিয়েত রাশিয়া অবশ্য টেলিপ্যাথি গবেষণার ফলাফল সম্পূর্ণ গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও ইএসপি গবেষণার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে কমপক্ষে আটটি ইএসপি গবেষণা কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সম্মোহিত করার ব্যাপারে তারা বেশ সাফল্য লাভ করেছেন।

তারা একটি কক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে সম্মোহনকারীকে নিয়ে যান অনেক দূরে। গবেষণাকারীরা নিজেদের ইচ্ছামতো সময়ে সম্মোহনকারীকে সম্মোহিত করতে বলেন। সম্মোহনকারী টেলিপ্যাথির মাধ্যমে তাদের সম্মোহিত করেন।

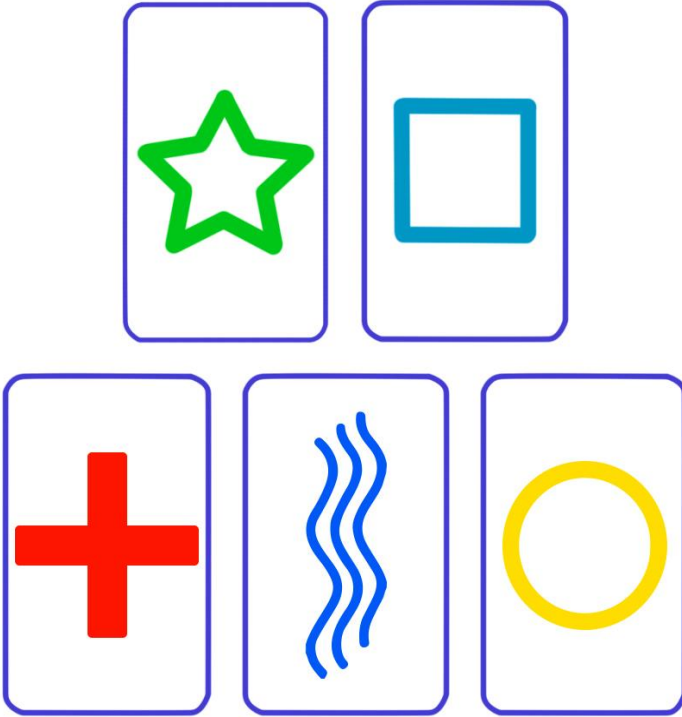
টেলিপ্যাথির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সাফল্যের আরেকটি চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেছে। সোভিয়েতের একটি ইএসপি গবেষণা কেন্দ্র সম্পূর্ণ ডট-ড্যাশ কোডে টেলিপ্যাথিক টেলিগ্রাফ করতে সক্ষম হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী দুই ব্যক্তির কেউই জানেন না কী তথ্য প্রেরিত ও গৃহীত হয়েছে।

অবশ্য সরকারিভাবে এ সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। তবে এ তথ্য সত্য হলে আমরা যে শিগগিরই টেলিপ্যাথির যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

টেলিপ্যাথির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজকাল অবশ্য অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

আমেরিকার একজন নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী হচ্ছেন মি. বাকমিনিস্টার ফুলার। তিনি একাধারে গণিতজ্ঞ, ডিজাইন বিজ্ঞানী, কার্টোগ্রাফার, ইঞ্জিনিয়ার, অটোমোবাইলের আবিষ্কর্তা এবং কবি। এক্সপো-৬৭ এর যুক্তরাষ্ট্রের প্যাভেলিয়নের ডিজাইনারও তিনি।

মি. ফুলার আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক সেমিনারে বলেন: সবারই টেলিপ্যাথিক যোগ্যতা রয়েছে-একথা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন আমি আদৌ আশ্চর্যান্বিত হইনি। সম্ভবত আগামী ১০ বছরের মধ্যেই আমরা আবিষ্কার করব যে, আমরা যাকে টেলিপ্যাথি বলি তা হচ্ছে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম-এর একটি অংশ।



জেনার কার্ড

মি. ফুলার পরে মাসিক আরগোসির নিবন্ধকার ওয়াল্টার ম্যাকগ্রোর সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, আমি মনে করি আমার সকল নিজস্ব ধারণা আসে মহাশূন্য থেকে। আমার মনে হয় এগুলো সবই পুরানো চিন্তা। হয়তো আমার আগেই কেউ এসব চিন্তা করে গেছে।

তিনি বলেন, আপনি যখন আকাশের দিকে তাকান তখন নিশ্চয়ই কোনো বাধা দেখতে পান না। আপনার তখন হয়তো কোনো চিন্তা আসে। আপনি হয়তো তা নিষ্কিপ্ত করেন উর্ধ্বাকাশে।

তা হয়তো তখন গিয়ে আঘাত করে কোনো নক্ষত্রে। আপনার এ চিন্তা একশো বা হাজার বছর পরে আবার হয়তো ফিরে আসতে পারে।

তিনি বলেন, আমাদের মনে আজকে যে চিন্তা সক্রিয় তা হয়তো গতকাল অন্য কারো মনে সক্রিয় ছিল।

সন্দেহ নেই, আমাদের সকলের টেলিপ্যাথিক যোগ্যতা রয়েছে। আর টেলিপ্যাথি আমাদের মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম-এর অংশ হলে সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয়, যখন বেতার তরঙ্গের ন্যায় ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামেরও নিয়ন্ত্রিত ও নির্ভরযোগ্য প্রক্ষেপণ ও গ্রহণ সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সোভিয়েত-মার্কিন প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে সাফল্যকে ত্বরান্বিত করবে।

আর সে সাফল্যের স্বর্ণদ্বার দিয়েই বেতার যুগকে অতিক্রম করে আমরা প্রবেশ করব টেলিপ্যাথিক যুগে। হয়তো টেলিপ্যাথিই হবে একবিংশ শতকে যোগাযোগ মাধ্যম। (সাপ্তাহিক বিচিত্র, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত)

জেনার কার্ড অনুশীলনী

১. জেনার কার্ড দিয়ে ইএসপি অনুশীলনীর জন্যে আপনি বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে দুটি গ্রুপ (যথা ক গ্রুপ ও খ গ্রুপ) গঠন করুন। দুজন হলেও এ অনুশীলনী করতে পারেন।

২. আপনি বা ক গ্রুপ থাকবেন একটি কক্ষে। অপরজন বা খ গ্রুপ থাকবে অন্য কক্ষে।

৩. অনুশীলনীর জন্যে ঘড়ি মিলিয়ে সময় নির্দিষ্ট করে নিন।

৪. 'আরাম,, 'আরাম,, 'আরাম, ও ১৯ থেকে ০ গণনা করে দেহমনকে পরিপূর্ণ শিথিল করে ধীরে ধীরে চোখ মেলুন। অলস দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখুন। ঘড়ির নির্ধারিত সময়ে জেনার কার্ডের যেকোনো কার্ডের ওপর একনিষ্ঠ মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

১৫ সেকেন্ড পর্যন্ত আপনি একটি কার্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন।

এরপর আপনি অপর কার্ডে চলে যাবেন। কোন্ কার্ডের পর কোন্ কার্ডে মনোযোগ দিলেন তা নিজে লিখে রাখুন বা অন্যকে বলুন লিখে রাখতে।

৫. অন্য রুমে অবস্থিত অপরজন বা খ গ্রুপ একই পদ্ধতিতে 'আরাম,, 'আরাম,, 'আরাম, বলে ১৯ থেকে ০ গণনা করে দেহমনকে পুরোপুরি শিথিল করে ধীরে ধীরে চোখ মেলে অলস দৃষ্টি বুলিয়ে যাবেন ঘড়ির ওপর।

নির্দিষ্ট সময় এলে সামনে রাখা জেনার কার্ডগুলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে যাবেন। সময় পাচ্ছেন ১৫ সেকেন্ড। অন্য রুমে অবস্থিত আপনার বন্ধু বা ক গ্রুপ কোন্ কার্ডে মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, সে সম্পর্কে আপনার যা মনে হলো, তা লিখে ফেলুন। গ্রুপে করলে একজন মনোযোগ দেবেন। তার যা মনে হলো তিনি মুখে বলবেন। অন্যজন লিখে রাখবেন।

৬. এভাবে ৫ মিনিট অনুশীলনের পর দুই গ্রুপ একত্র হয়ে মিলিয়ে দেখুন উভয়ের তালিকা। কতটুকু ঠিক হয়েছে নিজেরাই বুঝতে পারবেন।

৭. এবার খ গ্রুপ একই পদ্ধতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন আর ক গ্রুপ তা অনুভব করে ধারাবাহিকভাবে লিখে ফেলুন। একইভাবে মিলিয়ে দেখুন।

৮. এভাবে কিছুদিন চর্চা করলেই আপনার টেলিপ্যাথি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনি শতকরা ৯০ ভাগ নির্ভুলভাবে বলতে পারবেন- অপরজন কোন্ কার্ডের পর কোন্ কার্ডে মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন। কোনো কোনো ইএসপি গ্রাজুয়েটের ক্ষেত্রে সাফল্যের হার শতকরা ৯৮ ভাগ।

অধ্যায়-৩

টেলিপ্যাথি : মার্ক টোয়েনের অভিজ্ঞতা

‘টেলিপ্যাথি, কি অবাস্তব? তার তরঙ্গের ব্যবহার ছাড়াই কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী প্রিয়জনের নিকট কি নিজের কথা পৌঁছানো যায় না? আর ভাষা জানারই বা প্রয়োজন কি?

চিন্তা দ্বারা- শুধুমাত্র চিন্তা দ্বারাই কি দুই ব্যক্তির মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়? কোনো মাধ্যম ছাড়াই এক মস্তিষ্ক থেকে অপর মস্তিষ্কে বাণী প্রেরণ বা গ্রহণ কি অসম্ভব?

যদি তা অসম্ভবই হবে তবে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী পুত্রের অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার সাথে সাথেই মায়ের মন কেন উদ্বেল হয়ে ওঠে!

কেন দুই পরিচিত জনের ‘চিঠির পারস্পরিক অতিক্রমণ, ঘটে? অর্থাৎ দুজন কেন একই সাথে পরস্পরকে চিঠি লিখতে বসেন? বাড়িতে বা কোনো আড্ডায় বসে পরিচিত কারো নাম নিতে না নিতেই কেন অনেক ক্ষেত্রেই তাকে সশরীরে হাজির দেখতে পান?

‘টেলিপ্যাথি, বা ‘চিন্তাযোগাযোগ, সম্পর্কে আজকের দিনে অতীন্দ্রিয়-বাদীদের চৌহদ্দীর বাইরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও গত শতকের শেষদিকেও এটিকে মনে করা হতো অবাস্তব চিন্তা। এমনকি টেলিপ্যাথির আধুনিক আবিষ্কারক প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েন পর্যন্ত তার টেলিপ্যাথিক অভিজ্ঞতার কথা বহু বছর চেপেছিলেন- পাছে পাঠকরা তার বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দেয় এই ভয়ে।

মার্ক টোয়েন তার টেলিপ্যাথিক অভিজ্ঞতার কথা প্রথম লেখেন আজ থেকে একশো বছর আগে ১৮৭৮ সালে, ‘মেন্টাল টেলিগ্রাফি, নামক নিবন্ধে। ‘এ ট্রাম্প অ্যাব্রড, নামক গ্রন্থে তিনি এটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাঠকরা এটিকে কৌতুক মনে করে উড়িয়ে দেবে এই আশঙ্কায় তিনি তা বাদ দেন।

পাণ্ডুলিপি থেকে ‘মেন্টাল টেলিগ্রাফি, বাদ পড়লেও টেলিপ্যাথির ব্যাপারে মার্ক টোয়েনের আগ্রহে কোনো ভাটা পড়ে নি। তিনি এ ব্যাপারে একমনা লোকদের খোঁজ করতে থাকেন।

এরই মধ্যে ১৮৮২ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ’,।

১৮৮৫ সালে তিনি সোসাইটির সদস্য হন। সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করে মার্ক টোয়েন যে চিঠি লিখেছিলেন, তা 'জার্নাল অব দ্য সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ',-এর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। চিঠিটি নিম্নরূপ-

হার্টফোর্ড, কানেক্টিকাট, ৪ অক্টোবর ১৮৮৪।

প্রিয় মহোদয়,

সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের সদস্য করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ আপনারা যাকে 'চিন্তা স্থানান্তরণ, অথবা আমি যাকে মেন্টাল টেলিগ্রাফি বলি, সে বিষয়ে গত ৯/১০ বছর ধরে আমার গভীর আগ্রহ রয়েছে।

যখন কোনো গভীর তাড়নার বশবর্তী হয়ে আমি কোনো চিঠি লিখতে বসি, তখন নিজেকে শুধুমাত্র শ্রুতিলেখক বলে মনে হয়। কারণ একথা ভাবতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে- আমার সকল শক্তিশালী তাড়না আসে অন্য কারো কাছ থেকে।

আমার মনে হয়- আমার নিকট কেউ চিন্তা সরবরাহ করছে এবং আমি যেন তা শুনে শুনে লিখছি।

আমার আরো মনে হয় যখন অপর ব্যক্তি আমার নিকট চিন্তা সরবরাহ করে না, তখন সে আমার নিকট চিঠি লেখার তাড়না সরবরাহ করে।

যাই হোক, এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব তাড়না কখনো আমি সচেতনভাবে অনুভব করি নি। অবশ্য আমিও অবচেতনভাবে অপরের মধ্যে এ তাড়না সৃষ্টি করতে পারি।

গত দশকের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে আমার একটা সুবিধা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি চিঠি লেখার শক্তিশালী তাড়না অনুভব করি, তখন আমি বুঝতে পারি যে অপর ব্যক্তি সেই মুহূর্তেই আমি যা জানতে চাচ্ছি তা জানানোর জন্যে লিখতে বসেছে। আমি জানি না আমি তার মধ্যে তাড়না সৃষ্টি করেছি, না তিনি আমার মধ্যে তাড়না সৃষ্টি করেছেন।

যাই হোক, তেমন অবস্থায় আমি আর লিখি না (এবং এর ফলে আমার শ্রম বেঁচে যায়)।

অবশ্য কখনো কখনো চিন্তার অপেক্ষা না করেই তাড়না অনুসারে কাজ করে ফেলি। যেমন- একটি ঘটনা, আমার চুরট আসত ১২০০ মাইল দূর থেকে।

কয়েকদিন পূর্বে ৩০ সেপ্টেম্বর হঠাৎ আমার মনে হলো যে, চুরুটের জন্যে তিন সপ্তাহ পূর্বে যে অর্ডার দেয়া হয়েছিল, কোনো অজ্ঞাত কারণে এখনো তা প্রতিপালিত হয় নি। মনে হলো বিষয়টি তদন্তের জন্যে আমার আশু টেলিগ্রাম করা উচিত।

আমি টেলিগ্রামটি লিখে ফেললাম এবং তা টেলিগ্রাম অফিসে পাঠানোর উদ্যোগ নিলাম। এমন সময় আমার মনে হলো, 'এর প্রয়োজন হবে না, তারা চুরুটের ব্যাপারে এখন কিছু করছে,- এই অনুভূতি মাত্র আধা সেকেন্ডে ১২০০ মাইল ভ্রমণ করে আমার নিকট পৌঁছে।

চিঠির উপরোক্ত লাইনটি শেষ করতেই একজন চাকর একথা আমাকে জানায় যে, 'চুরুট এসে পৌঁছেছে। কিন্তু নিচের তলায় ডাকমাণ্ডুল পরিশোধ করার জন্যে কোনো পয়সা নেই।

আজ ৪ অক্টোবর দেখুন আমার বিশ্বাস কত যথার্থ। চুরুটের বিল এসে পৌঁছে ২ অক্টোবর এবং তা হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের।

আমি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, তারা সেদিন চুরুটের ব্যাপারে কিছু একটা করছে তা না হলে আমি সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্যে টেলিগ্রাম করার মতো তাড়না অনুভব করতাম না।

তাই মেন্টাল টেলিগ্রাম এর বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে এবং বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকে আমি দরিদ্রের জন্যে ৫০ সেন্ট বাঁচিয়েছি [আমিই সে দরিদ্র]।

গত ৯ বছরে এ ধরনের বহু ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। এ-ধরনের তাড়না অনুসারে কাজ না করে বহু চিঠি লেখা থেকে আমি নিজেকে বাঁচিয়েছি। আমি সবসময় জানতাম আমি যখনই তাড়না অনুভব করেছি তখনই অপর ব্যক্তি চিঠি লিখতে বসে গেছেন। তাই দুজনের একই জিনিস লেখার আর কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা প্রত্যক্ষ করেছি যে, বহু দূরত্ব অতিক্রম করেও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, তা করতে সক্ষম হওয়ার জন্যে দুটি মনকে তেমন মুহূর্তে বিশেষ ধরনের অনুকূল পরিস্থিতিতে থাকতে হবে। খুব ভাল, তবে কেন কোনো বিজ্ঞানী ইচ্ছানুসারে দুটি মনের মধ্যে তেমন অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে না?

তা হলেই তো আমরা টেলিফোনের মত শ্লথ ও বামেলাপূর্ণ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবো এবং বলতে পারব, 'পিকিং-এর পুলিশ প্রধানের মস্তিষ্কের সাথে আমার যোগাযোগ করে দিন।

তেমন ব্যক্তির ভাষা জানারও আমাদের প্রয়োজন হবে না। আমার শুধু ভাব দ্বারাই যোগাযোগ করব এবং এক ঘণ্টায় যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না তা কয়েক মিনিটে ভাব দ্বারা সম্পন্ন করব। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং শব্দের গতি এই যুগের তুলনায় খুবই জ্ঞাত। আমাদের অবশ্যই এমন কিছু পাওয়া উচিত, যা দ্রুততম।

আপনার বিশ্বস্ত- এসএল ক্রিমেন্স

মার্ক টোয়েন তাঁর 'মেন্টাল টেলিগ্রাফি, নিবন্ধের শুরুতে লিখেছেন, 'আপাতত তুচ্ছ হলেও প্রায় অহরহই আমার ব্যাপারে যা ঘটে থাকে তা হচ্ছে চিঠির পারস্পরিক অতিক্রমণ।

কয়েকদিন আগে আমি বলেছিলাম : আমরা যে জার্মানিতে রয়েছি ফ্রাংক মিল তা নিশ্চয়ই জানে, তা না হলে সে নিশ্চয়ই অনেক আগে লিখত।

গত ছয় সপ্তাহে কমপক্ষে ১২ বার আমি তার কাছে কিছু লেখার চিন্তা করেছি- কিন্তু না এবার আমি কিছু লিখব।

এবং তাই আমি লিখলাম। আমি প্যারিসের ঠিকানায় চিঠিটি ছেড়ে দিলাম এবং মনে করলাম চিঠিটি হাইডেলবার্গ থেকে ৫০ মাইল যাওয়ার আগেই আমরা তার চিঠি পাব....।

হ্যাঁ, আমি যেমন বলেছিলাম, আমি পাঁচ বা ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর আমি মাত্র তিন লাইন লিখি, কারণ আমি অনুভব করি যে, মিলের একটি চিঠি আমার চিঠিকে রাস্তায় অতিক্রম করবে এবং তা করেছে।

আমি যেদিন লিখেছি, সেও ঠিক সেদিনই লিখেছে... চিঠিতে মিল বলেছে, গত ছয় সপ্তাহ ধরে সে আমার জার্মান ঠিকানা জানে এমন কাউকে খুঁজছিল, কিন্তু কাউকে পায় নি।

শেষে তার মনে হলো, বার্লিনের মার্কিন দূতাবাসের প্রযত্নে কোনো চিঠি পাঠালে তা আমার কাছে পৌঁছাতেও পারে।

আমার এবং তার একই মুহূর্তে চিঠি লিখতে বসাটা হতে পারে কোন দৈবাৎ, ঘটনা কিন্তু আমি মনে করি তা কোনো দৈবাৎ ঘটনা নয়।

চিঠির পারস্পরিক অতিক্রমণ সম্পর্কে মার্ক টোয়েন তার ভাষ্যে লিখেছেন: 'আমরা পরস্পর অতিক্রমকারী চিঠি সম্পর্কে বলে থাকি, কারণ এটিই এই জীবনের অতি সাধারণ দৈবাৎ ঘটনাসমূহের একটি।

বহুরের অনেক সময়ই আমাদের মনে হয় যে, আমরা যে চিঠি লিখছি, তা অপরের চিঠিকে অতিক্রমণ করবে। যদি পাঠকরা তাদের স্মৃতিকে একটু ঝালিয়ে নেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তেমন ক্ষেত্রে অনেক সময়ই তারা তাদের চিঠিকে নিজের অজান্তেই সংক্ষেপিত করে ফেলছেন। আমার মনে হয়, সাধারণত এই তাড়না আমাকে তখনই পেয়ে বসত, যখন অপর ব্যক্তির কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার আশায় আমি চিঠি লেখা থেকে বিরত থাকতাম।

তাঁর ভাষ্যে তিনি আরো লিখেছেন : অপর ব্যক্তি আমাকে লিখবে এই আশায় অপেক্ষা করা আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর মনে হতো।

আমি তখন বসে পড়তাম এবং নিজের চিঠি লিখে ফেলতাম। তখন আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতাম যে সেই মুহূর্তে অপর ব্যক্তিও চিঠি লিখছে এবং আমার চিঠিকে অতিক্রমণ করবে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও একজনকে লিখে যেতে হবে, কারণ যদি আপনি চিঠি লেখা মূলতবী রেখে উঠে পড়েন, তবে অপর ব্যক্তিও তাই করবে।

এ প্রসঙ্গে মার্ক টোয়েন বৈদ্যুতিক মেরামতকারীর এক ঘটনা উদ্ধৃত করেন। একটি প্রতিষ্ঠান তার হার্টফোর্ড এর বাড়ির কিছু কাজ করে। কিন্তু তা সন্তোষজনকভাবে করা হয় নি। যখন বিল এল, তখন তিনি বিল পরিশোধ করার আগে সকল কাজ সম্পন্ন করতে বললেন। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জানানো হয় যে, তারা অত্যন্ত ব্যস্ত, তবে সক্ষম হলে একজন লোক প্রেরণ করবে।

দুমাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যায় মার্ক টোয়েন পুনরায় তাগিদ দেয়ার জন্যে লিখতে বসেছেন। এক পৃষ্ঠার মতো লেখা হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন যে, প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে।

তিনি চিঠি সংক্ষেপ করে ফেললেন এবং ডাকপিওনের জন্যে নিচের তলায় চিঠি রেখে এলেন। যাই হোক, পরদিন ভোরবেলা নাশতার জন্যে নিচে নেমে তিনি দেখেন যে, ডাকপিওন তখনও আসে নি। তবে বৈদ্যুতিক মেরামতকারী এসে কাজ করে চলে গেছে। সম্ভবত সে আগের দিন সন্ধ্যায় নির্দেশ পেয়ে রাতের ট্রেনে এখানে এসেছিল।

এরপর উদ্ধৃত ঘটনাটি ঘটেছে মার্ক টোয়েন ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছার পর। টোয়েন আর্লিংটন হোটেলে ওঠেন এবং রাত দশটায় সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি বাইরে থেকে ঘুরে আসবেন। তিনি জানতেন যে, তার জনৈক বন্ধু মি. ও ওয়াশিংটনে রয়েছে এবং তাকে তিনি খুঁজে বার করার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তার বন্ধু কোথায় উঠেছেন।

মাবরাতের দিকে টোয়েন একটি চুরটের দোকানে ঢুকলেন। চুরট কিনে বেরনোর আগে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : তিনি দরজার বাইরে যাবেন, বামে ঘুরবেন, দশ পা হাঁটবেন এবং তার বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবেন।

তিনি তাই করলেন এবং নিজের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঠিক সে স্থানেই তার বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলেন।

মার্ক টোয়েন মন্তব্য করেন যে, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসে মি. ওর সাথে সাক্ষাৎ পেলাম- এটা কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু আমি তার সাক্ষাৎ পেতে পারি, একথা পূর্বাঙ্কে জানা অবশ্যই একটা বড় ব্যাপার।

মার্ক টোয়েন ভাব যোগাযোগের পরবর্তী যে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, তা সম্ভবত তার কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এটি হচ্ছে নেভাদার ভার্জিনিয়া সিটির একজন সাংবাদিক উইলিয়াম রাইটের ঘটনা। তিনি 'স্প্যান দা কুইন, নামে লিখতেন।

মার্ক টোয়েন হঠাৎ অনুভব করলেন যে, নেভাদার রৌপ্য খনি সম্পর্কে একটি বই লেখার উপযুক্ত সময় ঘনিয়ে এসেছে। 'গ্রেট বোনানজার খবর তখন মুখে মুখে।

গ্রন্থকার হিসেবে তিনি বাছাই করলেন উইলিয়াম এইচ রাইটের নাম। রাইটের সঙ্গে ইতঃপূর্বে বহু বছর একসাথে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ২ মার্চ এই প্রকল্প হাতে নেয়া এমনকি বইয়ের রূপরেখা প্রদান করে রাইটের নামে একটি চিঠির মুসাবিদা করলেন।

এমন সময় টোয়েনের মনে হলো- তার পরামর্শ অনুসারে রাইট বই লেখার পর যদি কোনো প্রকাশক তা প্রকাশ করতে সম্মত না হয়, তবে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন।

এই কথা ভাবার পর তিনি চিঠিটি রাইটের কাছে পাঠানোর পরিবর্তে তার প্রকাশক ব্লিসের নিকট ব্যবসায়িক ব্যাপারে আলোচনার জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট করার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিরকুট পাঠালেন।

কিন্তু ব্লিস তখন শহরের বাইরে। চিরকুট জবাবহীন থেকে গেল এবং টোয়েন ব্যাপারটি ভুলে গেলেন।

৯ মার্চ তিনটি বা চারটি চিঠি এল। টোয়েন লক্ষ করলেন যে, একটি চিঠি এসেছে রাইটের নিকট থেকে। তিনি একজন দর্শনার্থী আত্মীয়কে বললেন : এখন আমি একটি অলৌকিক কাজ করব। এই চিঠিটি না খুলেই এটি লেখার তারিখ, এর বিষয়বস্তু সবই আমি তোমাকে বলে দেবো।

এটা এসেছে নেভাদার ভার্জিনিয়া সিটির জনৈক মি. রাইটের নিকট থেকে। এটি হচ্ছে সাত দিন আগে মার্চ মাসের দুই তারিখে লেখা।

মি. রাইট 'গ্রেট বোনানজা, এর রৌপ্য খনি সম্পর্কে একটি বই লেখার প্রস্তাব করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে, একজন বন্ধু হিসেবে এই সম্পর্কে আমার মতামত কী।

তিনি বলেছেন তার বিষয় হবে এই এই, তার ক্রমবিন্যাস হবে এই এই এবং তিনি গ্রেট বোনানজার একটি ইতিহাস সংযুক্ত করে বইটি সমাপ্ত করবেন।

মার্ক টোয়েন তারপর চিঠিটি খুললেন এবং সবাইকে দেখালেন যে, তিনি তারিখ ও বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। চিঠির বিষয়বস্তু আর টোয়েনের অপ্ৰেরিত চিঠির বিষয়বস্তু এক।

টোয়েন বলেছেন- তিনি সন্দেহ করতে পারেন না যে ২ মার্চ সকালবেলা আমার মন এবং মি. রাইটের মন অত্যন্ত সন্নিবিষ্ট ছিল এবং তিন হাজার মাইল দূরে থেকেও তাদের মন পরস্পরের সাথে স্ফটিক স্বচ্ছ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল।

আমি মনে করি না যে, উভয় মনই এই ভাবের মূল উৎস, বরং একটি মন থেকে তা উৎসারিত হয়েছে এবং তা অপর মনে প্রেরিত হয়েছে।

কোন মন এর প্রেরক আর কোন মন এর গ্রহণকারী তা জানার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। মি. রাইটকে আবার চিঠি লিখলাম, তার জবাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার মন থেকেই তা উৎসারিত ও প্রেরিত হয়েছে এবং আমার মন তা গ্রহণ করেছে।

টেলিপ্যাথি বা ভাব যোগাযোগ-এর আরেকটি উদাহরণ প্রসঙ্গে মার্ক টোয়েন লিখেছেন : গত হেমন্তে আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধু উইলিয়াম ডি হাওয়েলস আমার এখানে বেড়াতে আসেন।

তিনি বাস করেন আমার এখান থেকে একশো মাইল দূরে। আমাদের আলোচনাকালে তিনি বলেন যে, তিনি একটি সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়া উদ্ভাবন করেছেন, যা এর আগে সাহিত্যে কখনো ব্যবহৃত হয় নি।

তিনি সে সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত বললেন। আমি সাথে সাথেই তার হাতে একটি পাভুলিপি তুলে দিয়ে বললাম, তিনি একই আইডিয়া এই পাভুলিপিতেও পাবেন, যা আমি এক সপ্তাহ পূর্বে লিখেছি।

গত নভেম্বর থেকেই আইডিয়াটি আমার মাথায় ছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে আমি যখন তা কাগজে কলমে আবদ্ধ করছিলাম তখনই তা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে।

তিনি তখনো তার পাভুলিপি তৈরি করেন নি। তাই তিনি তা অলিখিতই ছেড়ে দিলেন এবং সানন্দে তার সেই আইডিয়ার সকল স্বত্ত্ব আমার নিকট হস্তান্তর করলেন।

আলোচনার উপসংহারে মার্ক টোয়েন ঘোষণা করেন, আমি একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে, মানবীয় মন রক্তমাংসে আবদ্ধ থাকলেও অপর মনের সাথে ট্রান্সমিটিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্যে কোনো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির কোনো কৃত্রিম প্রচেষ্টা ছাড়াই যে কোনো দূরত্বে যোগাযোগ করতে পারে। আমার মনে হয়, যখন অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করে, তখনই দুটি মন পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে, তা না হলে তারা তা করে না, এবং আমার আরো মনে হয় যদি অনুকূল পরিস্থিতি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রাখা যায়, তবে দুটি মন কোনো সময়সীমা ছাড়াই যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পারে।

নিবন্ধের প্রথম খসড়া লেখার তিন বছর পর টোয়েন এতে আরো নতুনতর তথ্য সন্নিবেশিত করেন। তিনি দাবি করেন যে- কারো কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার আশা করে অপেক্ষা করতে করতে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সে পছন্দ করুক আর নাই করুক, তখন আমি তাকে লিখতে বাধ্য করি।

অর্থাৎ আমি চেয়ারে বসে তার কাছে চিঠি লিখি এবং তারপর আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলি। আমি অত্যন্ত নিশ্চিত থাকি যে, আমার কাজ সেই মুহূর্তে আমার নিকট তাকে চিঠি লিখতে বাধ্য করেছে। আমার চিঠি ডাকে ছাড়ার প্রয়োজন হয় না- এখানে লেখাটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

মার্ক টোয়েনের পরিবারের সদস্যরা বিশেষভাবে তার স্ত্রী লিভি প্রায়ই টোয়েনের অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করতেন। মার্ক টোয়েন কোনো বাক্যের একাংশ বলামাত্র তার স্ত্রী অপর অংশ বলে দিতেন। তার অর্ধ উচ্চারিত বিষয় সমাপ্তকরণের এই পারিবারিক সুবিধা হয়তো বা আর একটি কারণ, যার জন্যে তিনি ঘোষণা করেছেন : আমি মনে করি যে, আমি জানি মন অপর মনের সাথে শব্দের স্তম্ভ ও বিরক্তিকর বাহন ছাড়াও সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

যদি তাই হয়, তবে ভাব যোগাযোগ বা টেলিপ্যাথি ত্বরান্বিত করার জন্যে কেন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে না।

মার্ক টোয়েন প্রায় ৭০ বছর আগে 'ফোনোফোন, আবিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন- ফোনোফোন হবে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মনের সাথে মনের যোগাযোগ একটা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে এবং একটি পদ্ধতির অধীন নিশ্চিত করা যাবে। সন্দেহ নেই, মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে বাতাসের মধ্য দিয়ে যা আমাদের চিন্তাকে বহন করে নিয়ে যায়, তা বিদ্যুতের চাইতেও অধিক গতিসম্পন্ন কোনো তরঙ্গ।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, একে ধরে রাখার উপায় বের করা এবং একে এর কাজ করতে বাধ্য করা, যেমনভাবে আমরা বিদ্যুৎ তরঙ্গকে কাজে লাগাচ্ছি।

বিশ শতকের শুরুতে টোয়েন যে 'ফোনোফোন, এর স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আর কতদিন স্বপ্ন থাকবে! (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায়-৪

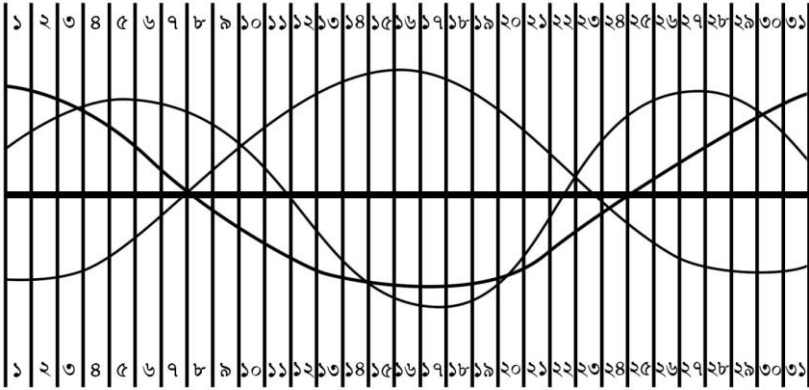
বায়োরিদম : আপনার জীবনছন্দ

দিন যায়। দিন আসে। কোনো দিন ভালো- উদ্দাম আর আনন্দ মুখরিত। বুদ্ধি তখন দ্রুত কাজ করে। শরীরে বল পাওয়া যায় প্রচুর। মন থাকে উৎফুল্ল। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সহজ। হাসতে খেলতে সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

আর কোনো দিন খারাপ- প্রাণহীন, বিষাদে ভরা। মস্তিষ্ক তখন কাজ করতে চায় না। শরীরে বল পাওয়া মুশকিল। অস্থিরতা হয়ে পড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তরায়।

অকারণে মন হয়ে পড়ে বিষাদক্লিষ্ট। কোনো কিছুই ভালো লাগতে চায় না। মেজাজ থাকে তিরিক্ষি। কাজ হয়ে যায় এলোমেলো। সবকিছুই কেমন যেন বেসুরো মনে হয়।

আপনার আমার সবার জীবনেই এই উত্থান-পতনের পালা চলছে। কিন্তু কেন এই উত্থান-পতন- এই ভালো লাগা খারাপ লাগা?



জীবনছন্দ চক্রের গ্রাফ

সভ্যতার প্রথম পর্যায়েই এ প্রশ্ন চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তুলেছে। তারা এই ভালোমন্দের কারণ খুঁজতে চেয়েছেন। ভালো দিন আর খারাপ দিন নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ভালো লাগা আর মন্দ

লাগা অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তবুও গবেষকরা আজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই ভালো লাগা আর মন্দ লাগার নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের 'জীবনছন্দ, (বায়োরিদম)।

আমাদের প্রাণশক্তির উত্থান-পতন ও জোয়ার-ভাটার নিয়ামক হচ্ছে 'জীবনছন্দ,।

আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের জৈবিক ছন্দ কাজ করে যাচ্ছে। তবে এই ছন্দগুলোর মধ্যে তিনটিই প্রধান।

প্রথমটি হচ্ছে ২৩ দিনের দেহছন্দ। এই ছন্দ প্রভাবিত করে দৈহিক শক্তি, শ্রম, ক্ষমতা, অধ্যবসায়, প্রতিরোধ, বিশ্বাস ও সাহস।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ২৮ দিন মেয়াদী আবেগছন্দ। এই ছন্দ প্রভাবিত করে আবেগ, অনুভূতি, স্নায়ু, ইনটুইশন, মেজাজ, আনন্দ ও সৃজনশীলতা।

তৃতীয়টি হচ্ছে ৩৩ দিন মেয়াদী বুদ্ধিছন্দ। এই ছন্দ প্রভাবিত করে মানসিক সতর্কতা, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি-যুক্তি, বিশ্লেষণক্ষমতা, প্রতিক্রিয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিটি মানুষের জন্মমুহূর্ত থেকে এই তিনটি ছন্দের সূচনা। আর প্রতি ২৩, ২৮ ও ৩৩ দিন পরপর পুনরাবৃত্তি ঘটে এই ছন্দের। জাতকের সারাজীবনেই চলতে থাকে এই ছন্দের খেলা। গ্রাফ করলে দেখা যাবে তিনটি ঢেউয়ের ক্রমাগত ওঠা-নামা।

জীবনছন্দ চক্রের ঢেউ যখন মধ্যরেখার ওপরে থাকে, তখন সময় আমাদের অনুকূলে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থাকে তখন।

যেমন ধরুন, দেহছন্দের এই অনুকূল সময়ে প্রাণপ্রাচুর্য থাকবে আপনার। কাজ করার শক্তি ও দৃঢ়তা দুই পাবেন।

আবেগ ছন্দের অনুকূল সময়ে আপনার মন হবে আনন্দময়। মেজাজ থাকবে ভালো। সৃজনশীলতার প্রকাশ হবে সহজতর। আর বুদ্ধিছন্দের অনুকূল সময়ে দ্রুত চিন্তা করতে সক্ষম হবেন আপনি। যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জটিল সমস্যার সমাধানও হবে সহজ। কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

আর যখন জীবনছন্দ চক্রের ঢেউ মধ্যরেখার নিচে থাকে, তখন সময় আপনার প্রতিকূল। প্রাণ-প্রাচুর্যের অভাব তখন সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। দেহছন্দের এই প্রতিকূল সময়ে আপনি সহজেই ক্লান্ত

হয়ে পড়বেন। উদ্যমের অভাব হবে। শরীরটাও ভালো মনে হবে না। অবসাদগ্রস্ত হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

আবেগহ্রদের প্রতিকূল সময়ে অকারণেই মন খারাপ লাগবে। মেজাজ সহজেই বিগড়ে যাবে। সহজেই বিষণ্ণ হয়ে পড়বেন।

বুদ্ধিহ্রদের প্রতিকূল সময়ে কোনো বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কঠিন হবে। স্মরণশক্তি সহজে কাজ করতে চায় না। আপনার বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতাও যাবে কমে।

এই তিনটি হ্রদের যে কোনো চেউয়ের গ্রাফের মধ্যরেখা অতিক্রমের দিনটি হচ্ছে 'সঙ্কটময়, দিন। এটি হচ্ছে দৈহিক প্রক্রিয়ার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ বা অবতরণের সময়। তখন আমাদের জীবন হ্রদে স্থিতিশীলতার অভাব সৃষ্টি হয়। এই 'সঙ্কটময়, বা স্থিতিহীন দিনগুলোয় আমাদের সবকিছু উল্টা-পাল্টা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এসময় আপনার অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। আপনার কাজে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে আপনি দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন।

তবে জীবনহ্রদের এই প্রক্রিয়া- কী ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বাণী নয়।

এই হ্রদ বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের আচরণের প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। আর জানা থাকলে আপনি সতর্কতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এই প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন।

জীবনহ্রদের অস্তিত্ব আবিষ্কার কোনো নতুন ঘটনা নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেয়াটস তার শিষ্যদের রোগীর অনুকূল দিনগুলোর দিকে নজর রাখতে বলেছেন।

আর রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে এই ক্রমাগত হ্রদের ওঠানামা সম্পর্কে সজাগ থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে বিশ শতকের প্রথম দশকে এসে জীবনহ্রদ চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

জার্মান ডাক্তার উইলিয়াম ট্রেস ও অস্ট্রিয়ান মনস্তত্ত্ববিদ হেরম্যান সবোদা চিকিৎসাধীন রোগীদের অসুস্থতা, অনুভূতি ও আচরণের তারতম্য লক্ষ করার পর হাজার হাজার রোগীর কেস হিস্ট্রি নিরীক্ষা করে পৃথক পৃথকভাবে ২৩ দিন মেয়াদী দেহহ্রদ ও ২৮ দিন মেয়াদী আবেগহ্রদ আবিষ্কার করেন।

এর প্রায় ২০ বছর পর অস্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আলফ্রেড টেলচার হাজার হাজার ছাত্রের পরীক্ষার ফল অনুসন্ধান করে ৩৩ দিন মেয়াদী বুদ্ধিহন্দ আবিষ্কার করেন।

জীবনহন্দ চক্র আবিষ্কারের পর থেকেই ইউরোপ আমেরিকায় এর ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

সুইজারল্যান্ডে লোকারনোতে ড. ফ্রেঞ্জ ওয়েবলির ক্লিনিকে রোগী ও ডাক্তারের জীবনহন্দ চার্ট অনুসারে অপারেশন করা হয়। শুধুমাত্র জরুরি ক্ষেত্রে ছাড়া কোনো রোগীকেই তার 'সঙ্কটময় দিনে, অপারেশন করা হয় না। আর কোনো সার্জনই 'নিজের, সঙ্কটময় দিনগুলোয় অপারেশন করেন না। এর ফলে সে ক্লিনিকে অপারেশন পরবর্তী জটিলতা শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরিবহন কোম্পানি তার ট্রাক ড্রাইভারদের 'জীবনহন্দ, চার্ট সরবরাহ করছে। ড্রাইভারদের তাদের 'সঙ্কটময়, দিনগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে। এভাবে এই পরিবহন কোম্পানি তাদের দুর্ঘটনার হার শতকরা ৬৬ ভাগ হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

বার্নার্ড গিটলসন তার 'বায়োরিদম : এ পার্সোনাল সায়েন্স, গ্রন্থে সাম্প্রতিক কালের ১৩টি বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এসব দুর্ঘটনার জন্যে কর্তৃপক্ষ পাইলটদের দায়ী করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি এ জীবন হন্দ গ্রাফ এঁকে দেখিয়েছেন যে, ১৩টির মধ্যে ১০টি ক্ষেত্রেই দিনটি ছিল পাইলট বা কো-পাইলটদের জন্যে 'সঙ্কটময়, দিন।

মি. গিটলসন বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 'জীবনহন্দ, পরামর্শদাতা। এর মধ্যে কয়েকটি এয়ারলাইনও রয়েছে।

আপনার জীবনহন্দ চক্রের চার্ট তৈরি করা খুব সহজ। আপনি নিজে ঘরে বসেই নিজের ও বন্ধু-বান্ধবদের চার্ট তৈরি করতে পারেন।

'জীবনহন্দ, চার্ট তৈরির ৭টি ধাপ নিম্নরূপ :

১। আপনার বর্তমান বয়সকে ৩৬৫ দিন দিয়ে গুণ করুন।

২। আপনার বর্তমান বয়সকে ৪ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফল যা পাবেন, তাকে প্রথম পর্যায়ে প্রাপ্ত দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করুন। ভাগের অবশিষ্ট যদি কোনো সংখ্যা থাকে তবে তা ভুলে যান।

৩। আপনার শেষ জন্মদিন থেকে চার্টের প্রথম দিন পর্যন্ত (আপনি যে মাসের চার্ট করতে চাচ্ছেন) মোট দিনসংখ্যা বের করুন। আপনার জন্মদিন এবং চার্টের প্রথম দিনও এই সংখ্যার মধ্যে ধরতে হবে। এবার প্রাপ্ত যোগফলকে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত মোট দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করুন। এবার জন্মদিন থেকে চার্টের প্রথম দিন পর্যন্ত আপনার বয়সের মোট দিন সংখ্যা পাচ্ছেন।

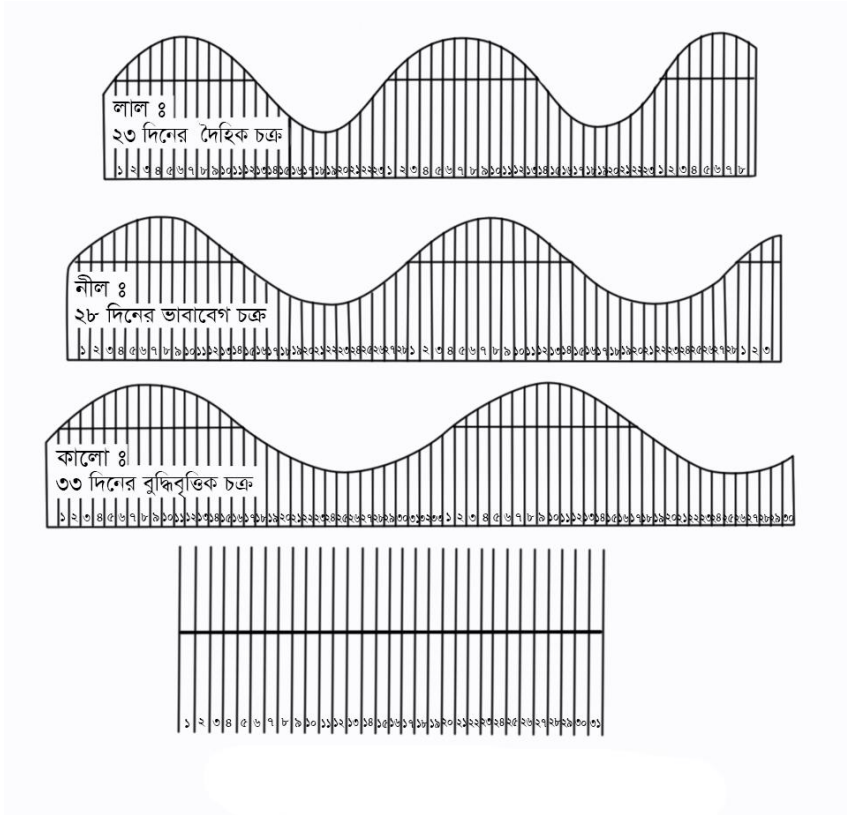
৪। আপনার জীবনের মোট দিনের সংখ্যাকে এবার প্রথমে ২৩ তারপর ২৮ এবং তারপর ৩৩ দিয়ে ভাগ করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাগফলকে ভুলে যান। শুধু অবশিষ্টাংশ নোট করে রাখুন। অবশিষ্টাংশই গুরুত্বপূর্ণ।

৫। উপরের সন্নিবেশিত ডেউ খেলানো রুলার কেটে নিন। কার্ড বোর্ডের ওপরে তা স্টেটে নিন। ডেউ খেলানো রুলারের আকৃতিতে কার্ড বোর্ড তিনটি কেটে নিন।

৬। আপনার জীবনের মোট দিনসংখ্যাকে ২৩ দিনে ভাগ করার পর যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে, দেহহৃন্দ চক্র রুলারের সে সংখ্যাটি বের করুন। এবার সেই সংখ্যাটি চার্টের প্রথম দিনের সংখ্যার ওপর স্থাপন করুন। চার্টের লাইনের ওপর রুলারের লাইনগুলো ঠিকভাবে রাখুন। রুলারের মধ্যরেখা যেন চার্টের ঠিক মধ্যরেখার ওপর থাকে সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে লক্ষ রাখুন।

এবার লাল কালির কলম দিয়ে রুলারের ডেউ বরাবর দাগ দিন। এটিই হবে আপনার আলোচ্য মাসের দেহহৃন্দ চক্র।

৭। আপনার জীবনের সর্বমোট দিনের সংখ্যাকে ২৮ ও ৩৩ দিয়ে ভাগ দেয়ার পর যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে সে সংখ্যা দিয়ে আবেগহৃন্দ চক্র রুলার ও বুদ্ধিহৃন্দ চক্র রুলার ব্যবহার করে একইভাবে ডেউ খেলানো গ্রাফ আঁকুন। আবেগহৃন্দ চক্র রুলার ব্যবহার করার সময় নিল কালির কলম দিয়ে দাগ টানুন। আর বুদ্ধিহৃন্দ চক্র রুলার ব্যবহারের সময় কালো কালির কলম দিয়ে দাগ টানুন। এ দুটোই হবে আলোচ্য মাসের জন্যে আপনার আবেগ ও বুদ্ধিহৃন্দ চক্র।



জীবনছন্দ চক্রের তিনটি স্কেল ও ব্ল্যাঙ্ক চার্ট

আপনার জীবনচক্রের এক মাসের চার্ট এখন প্রস্তুত।

এবার মাসের যে-কোনো দিনের জীবনছন্দ দেখার জন্যে প্রথমে চার্টের তলদেশের তারিখ দেখে নিন। দেখুন ডেউগুলো কোথায় তারিখের রেখাকে অতিক্রম করেছে।

ডেউগুলো যদি মধ্য রেখার ওপরে থাকে তবে জীবনছন্দের দিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে।

যদি ডেউগুলো মধ্য রেখার নিচে দিনের রেখাকে অতিক্রম করে তবে জীবনছন্দের দিক থেকে দিনটি আপনার প্রতিকূলে।

একটি ডেউ যেদিন মধ্যরেখাকে সরাসরি অতিক্রম করবে সে দিনটি জীবনছন্দের দিক থেকে 'সঙ্কটময় দিন'।

তাছাড়া মধ্যরেখার নিচে বা উপরে যে দিন দুটি ডেউ পরস্পরকে অতিক্রম করবে সেদিনটিও জীবনছন্দের দিক থেকে 'সঙ্কটময় দিন'।

সঙ্কটময় দিনের আগের দিন ও পরের দিন হচ্ছে আধা সঙ্কটময় দিন। এ দিনগুলোয় আপনাকে সব ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

আপনার জীবন চলার পথ এই জীবনছন্দ চার্ট অনেক সহজ করে দিতে পারে।

আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে জীবনছন্দের অনুকূল সময় ব্যবহার করুন। সিদ্ধান্ত নেয়া ও কাজ করা হবে সহজতর।

আর জীবন ছন্দের প্রতিকূল সময়ে আপনি সজাগ ও সতর্ক থেকে অনেক অঘটন এড়াতে পারেন। জনসংযোগমূলক পেশায় জড়িত ব্যক্তিদের এ চার্ট অনেক উপকার করতে পারে।

যারা যানবাহন চালান বা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এ চার্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সম্ভাব্য অঘটন ঘটার দিন সম্পর্কে পূর্বাঙ্কে সতর্কতা দুর্ঘটনা এড়াতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে সড়ক ও ট্রেন দুর্ঘটনার পরিমাণ বেড়ে গেছে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রের ন্যায় যানবাহন, ট্রেনচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জীবনছন্দ চার্ট অনুসারে পূর্বাঙ্কে সতর্কতা দুর্ঘটনার হার শতকরা ৫০ ভাগ কমাতে পারে। জীবন হয়ে উঠতে পারে আরো নিরাপদ।

(বাংলা ডাইজেস্ট, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায় -৫

চিকিৎসার নবদিগন্ত : চুম্বক তরঙ্গ

চুম্বন থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে চুম্বক শব্দটি। চুম্বনের প্রাণশক্তি হচ্ছে ভালবাসার। ভালবাসার দুর্নিবার আকর্ষণী শক্তিই কাছে টানে দুটি সত্ত্বাকে। চুম্বনের মধ্যেই অভিব্যক্তি লাভ করে এ ভালবাসা। ভালবাসার ক্ষমতা শুধু প্রাণিজগতেই সীমিত নয়।

নির্জীব জড় পদার্থও ভালবাসতে জানে। ভালবেসে কাছে টানে বলেই আমরা এ ধাতব পদার্থের নাম দিয়েছি চুম্বক। শুধু আমরা নই, চুম্বকের এই অনাবিল ভালবাসার জন্যেই ফরাসিরা একে বলে 'আইমানতে, (চুম্বনকারী প্রস্তর)। চীনারা বলে 'চুশি, (প্রেমময় পাথর)।

মানবজীবনে আনন্দ প্রশান্তির উৎস যেমন ভালবাসা, ভালবাসার শক্তি যেমন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, তেমনি চুম্বকের মধ্যে ভালবাসার যে সুপ্ত শক্তি রয়েছে, প্রতিটি চুম্বকের চুম্বক্ষেত্রে (magnetic field) প্রবাহিত চুম্বক তরঙ্গ মানবদেহের অনেক জটিল রোগ নিরাময়ে সক্ষম।

তাই অধুনা বায়ো-ম্যাগনেটিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে হাইপারটেনশন, অনিদ্রা, গ্যাস্ট্রিক, বাত-ব্যথা, উচ্চরক্তচাপ, অল্প ও পাকস্থলীর রোগ, প্যারালাইসিস, গলব্লাডার, কিডনি ও লিভারের যে-কোনো ব্যাধি নিরাময়ে সাফল্যজনকভাবে চুম্বকের প্রয়োগ করা হচ্ছে।

চুম্বকের প্রচণ্ড ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেই নিউইয়র্কের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ইকে ম্যাকলিন বলেছেন, 'শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রে ক্যান্সার বিরাজ করতে পারে না।

চুম্বক তরঙ্গের ক্যান্সার নিরাময়ে সক্ষম হলে অন্যান্য রোগ নিরাময়ে এর কার্যকারিতা সহজেই আঁচ করা যায়। চুম্বক তরঙ্গের এই প্রচণ্ড ক্ষমতার জন্যেই অতীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার করা হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে চুম্বক ধারণ করতেন। সৌন্দর্যের রাণী ক্লিওপেট্রা কপালে একটি চুম্বক ধারণ করতেন রূপযৌবন অটুট রাখার জন্যে। আমাদের দেশে সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্বক্ষুরে ব্যবহৃত লোহার আংটিতেও সুপ্ত থাকে এই চুম্বক শক্তি।

বিশ্ব এক বিশাল চুম্বক

চুম্বক বলতে আমরা মনে করি আকর্ষণী ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট লোহার টুকরো। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পৃথিবীও এক বিশাল প্রাকৃতিক চুম্বক। শুধু পৃথিবীই নয়, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যেকেই হচ্ছে এক একটি বিশাল চুম্বক। আমাদের সকল অস্তিত্বের মূলে নিহিত মৌল সত্যসমূহের একটি হচ্ছে এই চুম্বক শক্তি। পৃথিবীসহ প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র থেকে প্রতিনিয়ত বিকিরিত হচ্ছে চুম্বক বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এই চুম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করছে প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের চারপাশে দিগন্ত বিস্তৃত চুম্বক ক্ষেত্র।

বিজ্ঞানীদের পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহগুলো ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এক লাখ কিলোমিটার দূরেও পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব অনুভব করেছে।

পৃথিবী কীভাবে এত বিশাল চুম্বক শক্তির অধিকারী হলো তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একাধিক মতবাদ রয়েছে। তবে কার্যকারণ যাই হোক না কেন, পৃথিবীর এই বিশাল চুম্বক ক্ষেত্র সকল বস্তু ও প্রাণীর ওপর প্রত্যক্ষ ও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকার জন্যে মানবদেহেও রয়েছে একটা চুম্বক শক্তি। তাই কিছুক্ষণ চুল আঁচড়ে আমরা চিরুনির মধ্যেও সঞ্চরিত করতে পারি চুম্বক বিদ্যুৎ তরঙ্গ।

মানবদেহে চুম্বক শক্তির অস্তিত্বের কারণেই মানুষ মাটির যত কাছাকাছি থাকবে ততই সে হবে সুস্থ সবল। আমরা অনেকেই জানি খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটলে খুব সহজেই ক্লান্তি দূর হয়। এর কারণ হচ্ছে, মাটি থেকে পায়ের মধ্য দিয়ে চুম্বক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে সহজেই দেহের চুম্বক শক্তির মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসে।

ফলে আমরা সতেজ ও চাঙ্গা অনুভব করি। আমরা উত্তরে মাথা ও দক্ষিণে পা রেখে শয়ন করলে আমাদের শরীরের মধ্য দিয়ে চুম্বক-তরঙ্গ প্রবাহ সহজতর হয়। ফলে আমরা অনায়াসে গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তে পারি। কারণ সাধারণ চুম্বকের মতো পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রেও রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র যেমন আমাদের প্রভাবিত করছে, তেমনি পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রও প্রভাবিত হচ্ছে সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহের চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা।

শুধু তাই নয় এগারো বছর মেয়াদী সৌর কলঙ্ক চক্র দ্বারাও (sun spot cycle) পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। আর পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের যে কোনো পরিবর্তন অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষকেও প্রভাবিত করে।

আমরা জানি যে, মানবদেহ বিদ্যুৎ তরঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় শরীরের মধ্যেই। আর এরই সঙ্গে সৃষ্টি হয় চুম্বক তরঙ্গ।

আমরা দেখেছি বিদ্যুৎ ও চুম্বক তরঙ্গ জমজ বোনের মতো একে অপরের পরিপূরক। একই উৎস থেকে উৎসারিত। আমাদের শরীর যেমন বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে কাজ করতে পারে, তেমনি পারে চুম্বক পরিবাহী হিসেবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র মস্তিষ্কে প্রায় ত্রিশ ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হয়। আর মানব মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ডে ৮ কোটি সাইকেল চুম্বক বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিকিরণে সক্ষম এবং প্রতিনিয়তই তা করছে।

তবে আমাদের দেহের বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রও (electro-magnetic field) নানা কারণে ওঠানামা করতে পারে। এটা যেমন হতে পারে দেহের অভ্যন্তরীণ কোনো কারণে, তেমনি হতে পারে পৃথিবীর সামগ্রিক চুম্বক ক্ষেত্রের ওঠানামায়।

সামগ্রিকভাবে দেহের বা দেহের কোনো অঙ্গের বিদ্যুৎ চুম্বক ক্ষেত্রের ভারসাম্য নষ্ট হলে সেই অঙ্গের কার্যকারিতা কমে আসে, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। চুম্বক চিকিৎসার মূল কথা হচ্ছে- কৃত্রিম চুম্বকের সাহায্যে মানবদেহে চুম্বক তরঙ্গ প্রবাহকে স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ রেখে শরীরকে সুস্থ রাখা।

চুম্বক চিকিৎসার ইতিহাস

অধুনা চুম্বক চিকিৎসার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট হলেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে চুম্বক শক্তির প্রয়োগ অতি প্রাচীন।

কনফুসিয়াসের আমলের চীনা গ্রন্থ এবং ভারতের অথর্ববেদে চুম্বক চিকিৎসার কথা উল্লেখ রয়েছে। ফেরাউনের আমলে মিশরীয়রা চুম্বক শক্তির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত ছিল এবং মমি সংরক্ষণে তা ব্যবহার করেছে। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের সৎলাপে আমরা চুম্বক শক্তির উল্লেখ পাই।

প্রাচীন বিশ্বে চুম্বকের রহস্যময় শক্তিকে অনেকটা অলৌকিক বলে বিবেচনা করা হতো। চুম্বকের দির্কনির্দেশনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আরব মুসলমানরা প্রথম কম্পাস আবিষ্কার এবং সমুদ্র যাত্রায় এর ব্যবহার করেন।

আবহমানকাল থেকে চুম্বকের বিভিন্ন গুণাবলি আবিষ্কার ও এর ব্যবহার চলে এলেও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত চুম্বক সম্পর্কে কোনো বিধিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালিত হয়নি।

সুইস পদার্থবিজ্ঞানী পার্সেলসাস চুম্বক সম্পর্কে যুগান্তকারী গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং এর রোগমুক্তির ক্ষমতা আবিষ্কার করেন।

তিনি নিরীক্ষা করেন, চুম্বক প্রদাহ, ক্ষত এবং পাকস্থলীর রোগ সারাতে পারে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, শরীরের রোগাক্রান্ত অংশ চুম্বকের সাম্মিধ্যে আনলে ওষুধের চেয়ে তাড়াতাড়ি রোগমুক্তি ঘটে।

অস্ট্রীয় জ্যোতির্বিদ ফাদার হল সম্ভবত পার্সেলসাসের গবেষণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নার্তাস নারী-পুরুষের দেহে চুম্বক ধারণ করিয়ে নার্তাসনেসের সফল চিকিৎসা করেন।

সম্মোহনের আবিষ্কারক ডা. মেসমার চুম্বক শক্তি প্রয়োগ করে বহু জটিল রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

হোমিওপ্যাথির জনক ডা. হানেম্যান চুম্বকের রোগমুক্তির ক্ষমতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, চুম্বক শক্তি দ্বারা নিরাময় সম্ভব এমন যে-কোনো রোগে একটি চুম্বক দণ্ড কিছু সময়ের জন্যে শরীরের সঙ্গে লাগালে তা দ্রুত ও স্থায়ীভাবে রোগ নিরাময়ে সক্ষম। তিনি পুরো চুম্বক, শুধু উত্তর মেরু ও শুধু দক্ষিণ মেরু থেকে তিনটি পৃথক ওষুধ তৈরি করেন।

বিজ্ঞানী মাইকেল ফেরাডে জৈব চুম্বক তত্ত্ব এবং চুম্বক রসায়নের আবিষ্কার করেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি বস্তু কোনো না কোনোভাবে চুম্বক শক্তিসম্পন্ন। হয় তা চুম্বক শক্তি দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয়। বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন যে, গাছের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।

বিশ শতকে আমরা চুম্বক শক্তির বিবিধ ও ব্যাপক ব্যবহার দেখছি। ডায়নামো থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্সের প্রায় সবটাই চুম্বক শক্তি নির্ভর।

জাপানীরা যে দ্রুতগতি ট্রেন আবিষ্কার করেছে তাও চুম্বক শক্তি নির্ভর। কৃষি ও চিকিৎসাক্ষেত্রেও চুম্বকের প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে গবেষকরা চুম্বকায়িত পানি (magnetized water) সেচ করে দেখেছেন যে, তাতে গাছের প্রবৃদ্ধি বিশ থেকে চল্লিশ ভাগ দ্রুততর হয়। এমনকি মৃতপ্রায় গাছকেও চুম্বকায়িত পানি দিয়ে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করা যেতে পারে।

চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে গাছের সজীবতা বৃদ্ধি পায়, ফলনও বেশি হয়। সোভিয়েত ডাক্তার আইএন কোমারভ চুম্বকায়িত চিনি (magnetized sugar) খাইয়ে মাছির আয়ু দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইঁদুরের আয়ু বাড়ানো সম্ভব হয়েছে প্রায় দেড়গুণ। জাপানী ডাক্তার শিরো সাইতো চুম্বক প্রয়োগ করে ইঁদুরের ক্যান্সারের সাফল্যজনক চিকিৎসা করেছেন।

নিউইয়র্কের ডা. ইকে ম্যাকলিন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এন্টিভেটর দ্বারা সাফল্যজনকভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা করেছেন। তিনি চুম্বক ব্যবহার করে যে-কোনো ব্যাথা উপশমে সক্ষম হয়েছেন।

ক্রমাগত চুম্বকের ব্যবহার সাদা চুল কালো করতে সহায়তা করে। লেলিনগ্রাদের একটি ক্লিনিকে কিডনি ও গলব্লাডার স্টোন বিনষ্ট করার জন্যে নিয়মিত চুম্বকায়িত পানি ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ম্যাগনেটিক বেল্ট, ব্যান্ড ও চেয়ার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার নৈহাটির ডা. ভট্টাচার্য ইঁদুর ও খরগোশের শরীরে ক্যান্সার টিস্যু চুকিয়ে সেগুলোকে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে যান। ক্যান্সারের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থেমে যায়।

তিনি একই ইঁদুর ও খরগোশের শরীরে কয়েকবার ক্যান্সার টিস্যু চুকিয়ে প্রতিবারই চুম্বক তরঙ্গ প্রয়োগ করে এদের সুস্থ করে তোলেন। দিল্লীতে ডা. এইচএল. বানসাল চুম্বক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করছেন এবং এ সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজে নতুন আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশ শতকে এসে বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে-

১. প্রাণিদেহ চুম্বকের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তিশালী পরিবাহী ক্ষমতার জন্যে দেহের প্রতিটি কোষে চুম্বকের প্রভাব পৌঁছায়।
২. সারাদেহ বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং দেহের প্রতিটি অংশে চুম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। তাই চুম্বক দেহের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পদ্ধতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
৩. চুম্বক রক্তের ইরুথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেটকে (E.S.R) প্রভাবিত করে।
৪. চুম্বক দেহের টিস্যু ও জীবকোষের বিপাক ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।
৫. বাইরের চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়বিক পদ্ধতির (nervous system) কার্যক্রমের মধ্যে একটা সংযোগ রয়েছে। চুম্বক স্নায়ুর কাজকে স্বাভাবিক ও শক্তিশালী করে।
৬. চুম্বক ক্ষেত্র মস্তিষ্কের অগ্রভাগ ও গ্ল্যান্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যভাগকে সরাসরি প্রভাবিত করে। শরীরে হরমোন ও অন্যান্য তরল পদার্থের ক্ষরণ স্বাভাবিক করে।
৭. চুম্বক তরঙ্গ বংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক কোষ সঞ্চালন রীতিকে (genetic code) স্থিতিশীল করে।

চুম্বকের নিরাময় প্রক্রিয়া

সন্দেহ নেই, চুম্বক তরঙ্গ সামগ্রিকভাবে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গেই প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ তরঙ্গ প্রধানত কাজ করে রক্তের মাধ্যমে। আমরা জানি শরীরে যে চার থেকে পাঁচ গ্রাম লোহা আছে, তা অধিকাংশই রয়েছে রক্তে- হিমোগ্লোবিনের উপাদান হিসেবে।

লোহার অবস্থিতির জন্যেই চুম্বক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তপ্রবাহ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং স্থূলগুণ সৃষ্টি প্রক্রিয়া (Process of ionization) ত্বরান্বিত হয়, রক্তপ্রবাহ লাভ করে স্বচ্ছন্দ গতি। আয়নায়িত (ionized) রক্তপ্রবাহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং দেহাভ্যন্তরের পরিপাক, শ্বসন, রেচন, রক্ত সঞ্চালন, স্নায়বিক ও বিপাক পদ্ধতি তথা সকল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে অবসাদমুক্ত করে। এতে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড নতুন শক্তি লাভ করে। রক্তে সঞ্চালিত হালকা তাপ গ্ল্যান্ডসমূহকে সক্রিয় করে তোলে এবং স্বাভাবিক ক্ষরণ বজায় রাখে।

একইভাবে চুম্বক দেহের অন্যান্য তরল ও রাসায়নিক দ্রব্যের ওপর ক্রিয়া করে তা থেকে সবচেয়ে ভালো ফল আহরণ করে শরীরকে সমৃদ্ধ করে। একইভাবে দেহের জীবকোষের চুম্বক শক্তির উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করে চুম্বক ক্ষেত্রের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করে। আয়নায়িত রক্তের অবাধ প্রবাহ ধমনীতে কোলেস্টেরল ও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ যেমন জমতে দেয় না, তেমনি তার ফলে সৃষ্টি হয় নতুন জীবকোষ ও টিস্যু, গ্ল্যান্ডগুলো থেকে স্বাভাবিক ক্ষরণ, স্নায়ুতান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হয় ট্রুটিহীন, হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, মলমূত্র ত্যাগের প্রক্রিয়া হয় স্বাভাবিক। আর আমরা জানি রোগমুক্ত সুস্থ দেহের পেছনে এগুলোই হচ্ছে প্রধান চালিকাশক্তি।

চুম্বক চিকিৎসাপদ্ধতি

চুম্বক চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন আকারের চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এগুলোর শক্তিরও তারতম্য রয়েছে।

কতক চুম্বক প্রয়োগ করা হয় স্বল্প সময়ের জন্যে। কতক আবার ধারণ করা হয় সার্বক্ষণিকভাবে (যেমন হাত, মাথা ও কোমরের ব্যান্ড)।

আমরা জানি চুম্বকের দুটি মেরু রয়েছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেরু ব্যবহৃত হয়। যেমন-উত্তর মেরু ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংস করে। তাই এটি ফোঁড়া, একজিমা, চর্মরোগ, আলসার বা ঘা জাতীয় ব্যাধিতে প্রয়োগ করা হয়।

আর চুম্বকের দক্ষিণ মেরু তাপ ও শক্তি যোগায়। শরীরের যে-কোনো স্থানের ব্যথায় দক্ষিণ মেরু প্রয়োগে দ্রুত আরাম বোধ হয়। ক্রমান্বয়ে ব্যথা নাশ করে বিপর্যস্ত টিস্যুকে পুনর্জীবন দান করে।

চুম্বক চিকিৎসা : করণীয়-বর্জনীয়

○ শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহারের এক ঘণ্টার মধ্যে ঠান্ডা খাবার বা ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করবেন না। হালকা গরম খাবার, পানীয় ও চা গ্রহণ করতে পারেন। এক ঘণ্টার মধ্যে গোসল করবেন না।

○ পেট ভরে খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করবেন না। তবে হালকা নাস্তার পর চুম্বক ব্যবহার করা যেতে পারে।

○ মাথায় ও হৃৎপিণ্ডের ওপর কখনো শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করবেন না। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করা যাবে না।

○ দুটো শক্তিশালী চুম্বক মুখোমুখি ধরবেন না।

○ এন্টিম্যাগনেটিক না হলে আপনার ঘড়ি চুম্বক থেকে সবসময় দূরে রাখুন।

○ চুম্বক ব্যবহারের সময় মেঝে বা দেয়াল স্পর্শ করবেন না। চুম্বক ব্যবহারের সময় কাঠের চেয়ারে বসে কাঠের তক্তা বা পিড়ির ওপর পা রাখুন।

চুম্বক চিকিৎসা প্রধানত করা হয় দুভাবে। প্রথমত, স্থান বিশেষে প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত সাধারণ প্রয়োগ। ব্যাধি শরীরের কোনো বিশেষ স্থানে সীমিত হলে প্রয়োজন অনুসারে চুম্বকের উত্তর বা দক্ষিণ মেরু প্রয়োগ করা হয়।

আর ব্যাধি সারাদেহে বা দেহের ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে থাকলে অবস্থা অনুসারে দুহাতের তালুতে বা পায়ের পাতার নিচে চুম্বক প্রয়োগ করা হয়।

রোগভেদে ডান হাত ও ডান পা, বাম হাত ও ডান পা, ডান হাত ও বাম পা এবং বাম হাত ও বাম পায়ে চুম্বকের প্রয়োগ করা হয়। চুম্বকের সাধারণ প্রয়োগে দুটি পৃথক পৃথক মেরু প্রয়োগ করা হয়। বাম হাত ও বাম পায়ে সাধারণত দক্ষিণ মেরু এবং ডান হাতে ও ডান পায়ে সাধারণত উত্তর মেরু প্রয়োগ করা হয়।

সকালে নাস্তার আগে চুম্বক প্রয়োগ সবচেয়ে ভালো। সাধারণত দশ মিনিট চুম্বক প্রয়োগ করা হয়। তবে প্যারালাইসিস, বাতব্যথা, হাঁপানি ও জটিল ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রথমে দশ মিনিট থেকে শুরু করে তা ক্রমান্বয়ে বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট করে প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে সকাল-সন্ধ্যা

দু'বেলা চুম্বক প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে দশ পনেরো দিন চুম্বক প্রয়োগই যথেষ্ট। তবে জটিল ক্ষেত্রে তিন চার মাসও তা প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

সাধারণ রোগ-ব্যাদি ছাড়াও মহিলারা চুম্বক থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন প্রসব বেদনার সময়। প্রসব বেদনা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে রাখলে প্রসব বেদনা শতকরা সত্তর থেকে নব্বই ভাগ হ্রাস পাবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রক্রিয়া হবে ত্বরান্বিত। প্রসব বেদনা হ্রাস ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্যে গত কয়েক বছর বহু মহিলা চুম্বক ব্যবহার করে অব্যর্থ ফল পেয়েছেন।

যারা পুত্র সন্তান লাভ করতে চান, তাদের জন্যেও সুখবর আছে। খবরটি দিয়েছে ভারতের বোম্বের একটি চুম্বক তৈরি কারখানার কর্মকর্তারা। এই কারখানায় কর্মরত বিবাহিত কর্মীদের কারখানায় যোগদানের পর শুধুমাত্র পুত্রসন্তানই হয়েছে- কোনো কন্যা সন্তান হয় নি। তাই যারা একাধিক কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান লাভে আগ্রহী তারা চুম্বক ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

উপসংহারে বলা যায়, চুম্বক চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ, সরল ও নিরাপদ চিকিৎসা। এতে ওষুধ খেতে হয় না, ইঞ্জেকশন নিতে হয় না, ক্যাপসুল, ভিটামিন বা টনিকে অবগাহনের প্রয়োজন হয় না। চুম্বক তরঙ্গের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই, আর এতে ব্যয়ও কম। একবার একজোড়া চুম্বক কিনে নিলে শুধু নিজের নয় তা দিয়ে শত শত লোকের চিকিৎসা বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে। চুম্বক কখনো তার শক্তি হারিয়ে ফেললে তা আবার চার্জ করে নেয়া যায়। একই চুম্বক ব্যবহার করা যায় সকল রোগে তা সে দাঁত ব্যথা হোক বা বাতব্যথা, এজমা বা আর্থরাইটিস, অনিদ্রা বা প্যারালাইসিস, একজিমা বা আলসার। একই চুম্বক সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করবে।

অমৃতসম পানীয়

পানীয়ের রাজা চুম্বক পানি। যে অমৃতের সন্ধানে দেবতা ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, চুম্বক পানিই হতে পারে তার বিকল্প। দেহের যে কোনো রোগে এটি উপকারি- বিশেষত পরিপাক ক্রিয়া ও মূত্রাশয়ের ব্যাধিতে। নিয়মিত চুম্বক পানি ব্যবহারে পাকস্থলীর হজম শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, বায়ু নির্মূল করে, এসিডিটি হ্রাস করে, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, পিত্ত স্বাভাবিক রাখে, গলব্লাডার ও কিডনির পাথর নাশ করে, আলসার নিরাময় করে, দেহের ভেতরে অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু জমাট বাঁধতে দেয় না। চুম্বক-পানি প্রাপ্ত বয়স্করা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর মিলিলিটার এবং শিশুরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিলিটার করে প্রতিদিন তিন/চার বার করে পান করবেন।

চুম্বক পানি আপনি নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন। দুটো শক্তিশালী চুম্বকের (একটির উত্তর মেরু এবং অন্যটির দক্ষিণ মেরু) ওপর দুটি বোতলে পানি ভরে বারো থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখলে দুটো বোতলের পানিই চুম্বকায়িত হয়ে যাবে। এরপর দুটো বোতলের পানি পানের জন্যে তৈরি হয়ে গেল। চুম্বক পানির কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বছরের পর বছর সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেও তা পান করা যেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে- চুম্বকের সংস্পর্শে পানির বোতল দীর্ঘক্ষণ রাখলে পানির বিভিন্ন গুণাবলি যেমন- তাপ, ঘনত্ব, সান্দ্রত্ব, সারফেস টেনশন ও বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। চুম্বক পানির মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থের পলল (Sedimentation) ত্বরান্বিত করে এবং পানিকে দ্রুত আয়নায়িত (ionization) করে।

পানির মতো ফলের রস ও দুধকেও চুম্বকায়িত করা যায়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চুম্বকের দক্ষিণ মেরু ২/৩ ঘণ্টা ব্যবহার করতে হবে। চুম্বকায়িত ফলের রস ও দুধ শক্তি ও উদ্দাম বৃদ্ধিতে সহায়ক।

চুম্বক পানি ফুল বা ফলের গাছে নিয়মিত প্রয়োগ করলে ফুলের আকার ও সুবাস এবং ফলের ফলন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

(সাপ্তাহিক রোববার, ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায়-৬

আঙ্গুলের পরশে ব্যথা নিরাময়

শরীরের যে কোনো স্থানে ব্যথা আমাদের কাতর করে তুলতে পারে। ওষুধের বিকল্প হিসেবে শুধুমাত্র দেহের নির্দিষ্ট বিন্দুতে মালিশ করে বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধার নিরাময় হতে পারে। এই মালিশ পদ্ধতি চীনের বিখ্যাত আকুপাংচার পদ্ধতির অনুরূপ।

আমাদের চিরায়ত ধারণা, অনুভূতির সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটি : স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ ও ধ্বনি। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা এই অনুভূতি লাভ করে থাকি। কিন্তু আমাদের আরেকটি অনুভূতি সবসময় অব্যক্ত থেকে গেছে। এই অনুভূতির নাম ব্যথা।

আর এই ব্যথা অনুভূত হতে পারে শরীরের যে-কোনো স্থানে। মাথা বলুন আর ঘাড়, পিঠ বলুন অথবা হাঁটু, পেশী বলুন বা হাড় যে কোনো জায়গায় হতে পারে। আর ব্যথার টিকে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ। কোথাও ব্যথা হলে বুঝতে হবে শরীরের কোথাও কোনো গুণ্ডগোল হচ্ছে।

ব্যথা সেই গুণ্ডগোল সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে যাতে করে আপনি দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ব্যথা-বেদনা নিরাময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যথার সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। এটি সতর্কতাসূচক না হয়ে প্রায় স্থায়ী রূপ নিতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ব্যথা আপনাকে কাতর করে তুলতে পারে।

যন্ত্রণাদায়ক এই ধরনের ব্যথা-বেদনায় আমরা প্রায়ই আক্রান্ত হই। তখন আমরা বুঝতে পারি না আমাদের কী করা উচিত। অনেক সময় ব্যথার ওষুধ খেয়ে নিরাময়ের চেষ্টা চালাই। ওষুধে হয়তো আপনি সাময়িকভাবে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আপনার শরীরে সুদূরপ্রসারি ক্ষতির কারণ হতে পারে। অথচ আপনি শুধুমাত্র আঙ্গুলের পরশে এই ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় আঙ্গুলের ডগা দিয়ে কিছুক্ষণ মালিশ করে আপনি বেদনার উপশম ঘটাতে পারেন।

এই পদ্ধতি অনেক প্রাচীন। চীনের বিখ্যাত আকুপাংচার পদ্ধতিরই একটি বিশেষ সংস্করণ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের লালন ক্ষেত্র চীনে হাজার হাজার বছর ধরে এই চর্চা চলে এলেও আমরা এই সম্পর্কে জানতে পারি এই শতাব্দীর শুরুতে। পাশ্চাত্যের উন্নাসিক বিজ্ঞানীরা প্রথমে আকুপাংচার

পদ্ধতি নিয়ে পরিহাস করলেও পরে এর কার্যকারিতা দেখে হতবাক হয়ে যান। প্রথমে অসম্ভব মনে করলেও এখন তারা একে বাস্তব বলেই মেনে নিয়েছেন।

আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতিতে দেহের বিশেষ বিশেষ বিন্দু দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। যখন বিন্দুগুলোকে মালিশের মাধ্যমে সজাগ করা হয় তখন সেই নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথা নিরাময় হয়। এই বিন্দুগুলো যদিও খুব ছোট, আয়তনে আধা বর্গ মিলিমিটার মাত্র তবুও তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। আর একবার এই বিন্দুগুলোকে শনাক্ত করতে পারলে ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ এই বিন্দুগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং আশেপাশের পেশী থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির।

এই বিন্দুগুলো শনাক্ত করার পর তর্জনী বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর ডগা এতে স্থাপন করুন। নিচের দিকে চাপ দিন, আঙ্গুলের ডগাকে মৃদুভাবে নাড়তে থাকুন অথবা ডান থেকে বামে ঘুরাতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরেই আপনি ব্যথা-যুক্ত অঙ্গে আরাম বোধ করবেন।

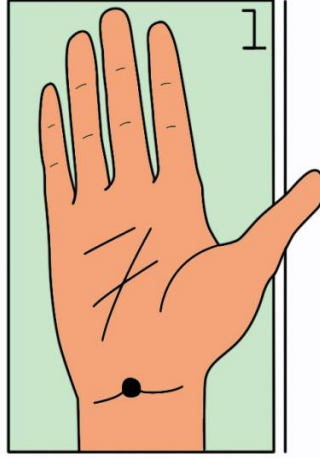
মাথা ব্যথা ও বাত ব্যথার ওষুধ খেয়ে আপনি যতটা আরাম বোধ করবেন এই পদ্ধতিতে আপনি কমপক্ষে ততটা আরাম পাবেন।

শুধু ব্যথা নয় বিষণ্ণতা ও অনিদ্রার মত বিরজিকর উপসর্গ থেকেও আপনি অব্যাহতি পেতে পারেন।

মনে রাখবেন মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা ভেদে ওষুধের প্রতি শরীরের সাড়ায় যেমন পার্থক্য ঘটে, তেমনি আঙ্গুলের ডগার মালিশেও শরীরের সাড়া পেতে পার্থক্য হতে পারে। তবে সাধারণত কয়েক মিনিট মালিশই যথেষ্ট।

একইভাবে ব্যথার নিরাময়কালও জনে জনে আলাদা হতে পারে। কখনো কখনো নিরাময়ের স্থিতি হতে পারে কয়েক মিনিট, কখনো কয়েক ঘণ্টা, কখনো বা কয়েক দিন। কিন্তু বারবার মালিশ করায় বিন্দুর কার্যকারিতা হ্রাস পায় না। যখন আবার নিরাময়ের প্রয়োজন তখন একই পদ্ধতিতে একই বিন্দুতে মালিশ করলে কাজিষ্কত ফল লাভ করা যায়।

পুড়ে গেলে

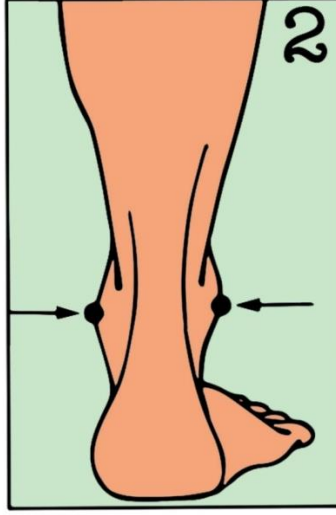


চামড়ার কোথাও ছেঁকা লাগলে এক ধরনের যন্ত্রণা বা জ্বালা অনুভূত হয়। ছেঁকা লাগা জায়গার চামড়া পুড়ে ফোসকা উঠে গেলে আপনি অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন।

কিন্তু যদি ছেঁকা লেগে লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং জ্বলতে থাকে তাহলে হাতের একটি বিশেষ বিন্দুতে মালিশ করে আরাম পেতে পারেন।

হাতের এই বিন্দুটি হচ্ছে কজির ভাঁজের মাঝামাঝি স্থানে। (১নং চিত্র দেখুন) এই বিন্দুতে ভালোভাবে মালিশ করুন। যে কোনো কারণেই ঘটুক না কেন পোড়া স্থানে জ্বালা কমে যাবে।

গোড়ালি মচকে গেলে



হাঁটতে গিয়ে গোড়ালি মচকে যেতে পারে যে কোনো সময়। আর এ মচকে যাওয়া মারাত্মক হতে পারে আপনার জন্যে। কারণ শুধু মচকানো নয়, হাড়ও ভেঙ্গে যেতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে। আর তাহলে গোড়ালিতে ব্যথা হবে প্রচণ্ড এবং জায়গাটা ফুলে যাবে। আপনি এক্স-রে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন। কিন্তু তার আগে একটু মালিশ করে শুধু ব্যথা নয়, ফোলাও কমাতে পারেন।

এক্ষেত্রে আপনাকে গোড়ালির হাড়ের সংযোগের তলার কাছাকাছি ভেতরে ও বাইরে দুটি বিন্দুর যে-কোনোটিতে ভালোভাবে চাপ বা মালিশ করতে হবে। কোথায় মালিশ করতে হবে। কোথায় মালিশ করবেন তা নির্ভর করবে ভেতরে বা বাইরে কোনদিকে আঘাত পেয়েছেন তার ওপর (২নং চিত্র দেখুন)।

তবে সতর্ক থাকবেন ওই বিন্দুতে এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করে মালিশ করবেন যাতে করে ভেতরের কোনো কিছু নড়ে না যায়। কারণ হাড় ভেঙ্গে গেলে ভাঙ্গা হাড়ের সামান্য স্থান পরিবর্তনও ক্ষতিকর হতে পারে।

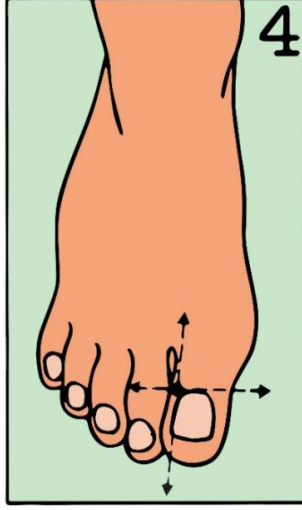
গলা বসে গেলে



ঠান্ডা লেগে বা হঠাৎ উচ্চস্বরে কথা বলা বা টেঁচামেচি করার কারণে আপনার কণ্ঠস্বর বদলে যেতে পারে, গলা ভেঙ্গে যেতে পারে বা এমন হতে পারে যে, গলা দিয়ে কোনো স্বরই বের হচ্ছে না।

এমন হতে পারে যে, প্রদাহের কারণে আপনার কণ্ঠনালী ফুলে যাওয়ায় তা স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে না পারায় যথাযথ স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারছে না। এক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর পুনরুদ্ধারে মালিশ খুব উপকারি প্রমাণিত হতে পারে। হাতের কজির শেষ ভাঁজ থেকে তিন আঙ্গুল উপরে মাঝামাঝি জায়গায় এ বিন্দুটি অবস্থিত (৩নং চিত্র দেখুন)।

কোষ্ঠকাঠিন্য

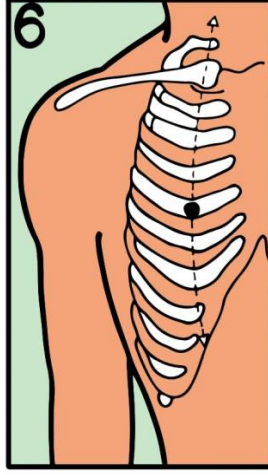


কোষ্ঠকাঠিন্য মূলত পাশ্চাত্যের রোগ। এখন আমাদের সমাজেও এর বিস্তার যথেষ্ট। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে কায়িক শ্রমের অভাব, ব্যায়াম না করা এবং সুষম খাবার না খাওয়া। সবুজ শাকসব্জি এবং আঁশ জাতীয় খাবার না খেলে এবং প্রচুর পানি পান না করলে এ রোগ মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে।

অধিকাংশ মানুষই বড়ি বা ওষুধের আকারে ল্যাকজেটিভ বা জোলাপ গ্রহণ করে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে। এতে সমস্যা না কমে বেড়েই যায়। হয় এতে অন্ত্রের প্রদাহ ঘটে এবং তা ডায়রিয়ার রূপ নিয়ে শরীরের ক্ষতিসাধন করে অথবা অন্ত্র জোলাপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরে ক্রমান্বয়ে বেশি মাত্রার ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এই কোষ্ঠকাঠিন্য উপশমে মালিশ অত্যন্ত উপকারি হতে পারে। আর এ বিন্দুটি বের করাও খুব সহজ। এটি পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখের নিচে ভেতরের কোণায় অবস্থিত (৪নং চিত্র দেখুন)। কিছুদিন নিয়মিত উক্ত বিন্দুতে মালিশ করলে আপনিও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্ত হতে পারেন।

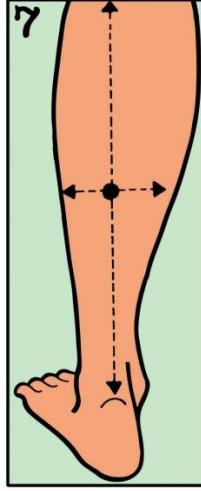
মানসিক আঘাত পেলে



মানসিক আঘাত শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে এবং শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত প্রতিরক্ষা শক্তির ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তি নির্দিষ্ট চ্যানেলে শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তাই এই চ্যানেলগুলোর মধ্যে অবস্থিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে মালিশ করলে রোগীর অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

অবশ্য এই মানসিক আঘাত দুঃসংবাদ, শোক বা হতাশাজনিত কারণে ঘটতে পারে। তবে কারণ যাই হোক না কেন- মালিশ করার জায়গা একটাই। মালিশের এই বিন্দুটি বুকের ডান দিকে স্তনের বাঁটার চার আঙ্গুল উপরে পাঁজরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাড়ের মাঝামাঝি (৬নং চিত্র দেখুন)।

পায়ে ঝিচুনি

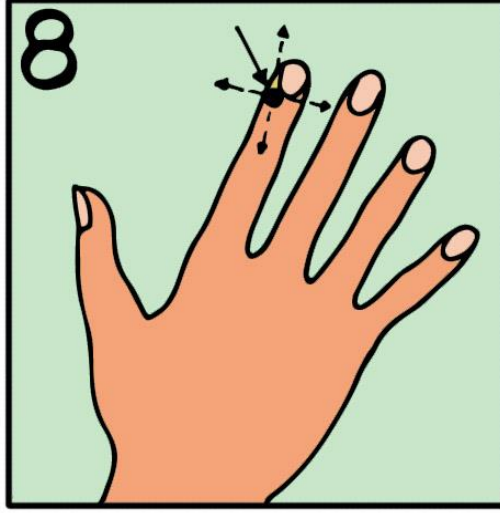


বয়স্ক লোকদের সাধারণত রাতে পায়ে ঝিচুনির ব্যথায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। আবার অতিরিক্ত ব্যায়াম করার কারণে যেমন দৌড়, সাইকেল চালনা বা সাঁতার কাটার ফলেও পায়ের পেশীতে ঝিচুনি ধরতে পারে।

পায়ের পেশীতে ঝিচুনির ব্যথা থেকে নিরাময় লাভের বিন্দুটি পায়েই অবস্থিত। এটি প্রত্যেক পায়ের কাফমাসলের মাঝে রয়েছে। এটি পায়ের পেছনে হাঁটুর ভাঁজ থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত দূরত্বের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত।

আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়- আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে কাফমাসলের পেশীতে যেখানে ভাঁজ সৃষ্টি হয় সেখানেই এই বিন্দুটি অবস্থিত। এই বিন্দুটি একটু গভীরে থাকায় মালিশ একটু চাপ দিয়ে করতে হয়। বিন্দুটির অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে (৭নং চিত্র দেখুন)।

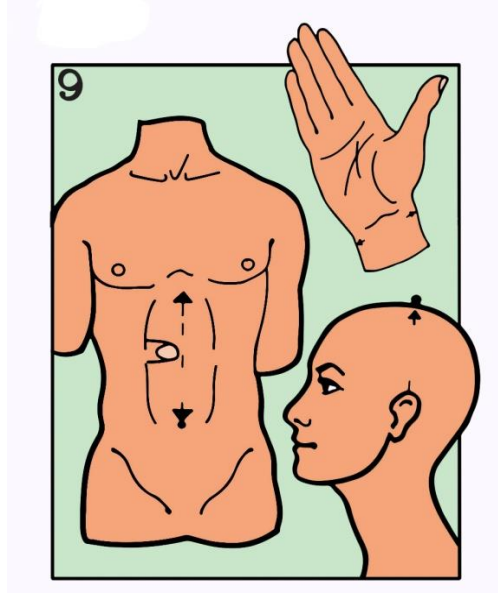
দাঁতের ব্যথা



দাঁতের ব্যথায় ভোগেন নি এমন লোক নেই বললেই চলে। আর ডাক্তাররা বলেন, প্রসব বেদনার পরেই নাকি দাঁতের ব্যথার স্থান। আপনার যে-কোনো সময় দাঁত ব্যথা করতে পারে। তাই এই ব্যথা উপশমের বিন্দুটির অবস্থান জানা থাকলে আপনি উপকৃত হবেন। আর সৌভাগ্যের কথা এই যে, এই বিন্দুটিকে সহজেই বের করা যায়। এটি তর্জনীতে বুড়ো আঙ্গুলের দিকে অবস্থিত।

এটি নখের নিচ দিয়ে একটি সরলরেখা টানলে এবং নখের পাশ দিয়ে আরেকটি সরলরেখা টানলে যে বিন্দুতে ছেদ করে সমকোণ সৃষ্টি করবে সেই বিন্দুতেই অবস্থিত (চলং চিত্র দেখুন)।

আপনার দাঁতের ব্যথা ডানদিকে হলে ডান হাতের তর্জনী আর ব্যথা বামদিকে হলে বাম হাতের তর্জনীর নির্দিষ্ট বিন্দুতে মালিশ করুন। তবে মনে রাখতে হবে যে, এই মালিশ দ্বারা দাঁতের ক্ষয়রোধ হবে না কিন্তু একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যথাকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এই মালিশ অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াও চিকিৎসার সহায়ক হতে পারে।

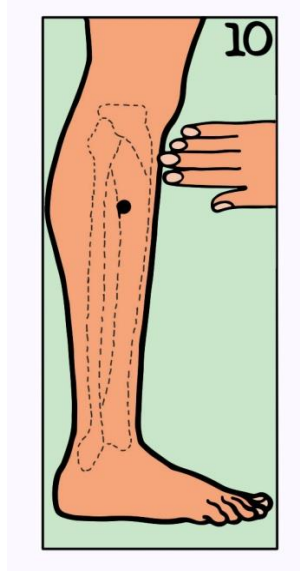


দীর্ঘদিনের বিষগ্নতা একটি কঠিন রোগ যার সুচিকিৎসা প্রয়োজন। তবে এই বিষগ্নতাকে আগেভাগেই প্রতিরোধ করা যেতে পারে। পারিপার্শ্বিক চাপের প্রভাবে সৃষ্ট বিষগ্নতা প্রথম থেকে উদ্যোগ নিলে সহজেই কাটিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু যদি বিষগ্নতা একবার বাসা বেঁধে ফেলে তাহলে একটি বিশেষ বিন্দুতে মালিশ করে ফল পাওয়া যাবে না। বেশ কয়েকটি বিন্দুতে মালিশ করতে হবে।

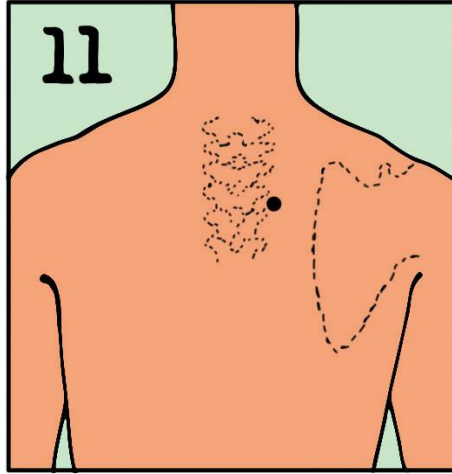
এমন হলে চিং হয়ে শুয়ে পড়ুন। রিলাক্স করুন এবং কজির ভাঁজে আস্তে আস্তে অন্য হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মালিশ করুন। প্রথমে একদিকে পরে অন্যদিকে। তারপর নাভিমূল এবং বুকের কড়ার মাঝামাঝি স্থানে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মালিশ করুন।

সবশেষে মাথার খুলির সর্বোচ্চ স্থানে কুণ্ডলী আকারে মালিশ করুন। খুলির সর্বোচ্চ স্থান আপনি পাবেন দুই দিকের কান বরাবর মাথার ওপর দিয়ে সরলরেখা টানলে তার মাঝখানে (৯নং চিত্র দেখুন)। দিনে কয়েকবার এভাবে মালিশ করুন। আস্তে আস্তে আপনি দেখবেন বিষগ্নতা কাটিয়ে উঠছেন।

ডায়রিয়া



ডায়রিয়া গুরুতর হলে সুচিকিৎসা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ ডায়রিয়া হলে মালিশে খুবই উপকার হতে পারে। চীনে কলেরা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও এই বিন্দু ব্যবহার হয়। অবশ্য এই বিন্দুটি শনাক্ত করতে আপনাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। এটি পায়ের বাইরের দিকে হাঁটুর চাকতির (নিক্যাপ) পাঁচ আঙ্গুল নিচে অবস্থিত (১০নং চিত্র দেখুন)।

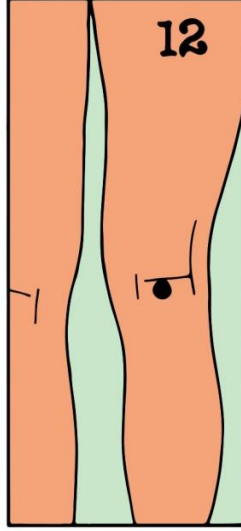


দম বা শ্বাসকষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে বিভিন্ন। সবসময় যে তা হার্ট, ফুসফুস বা স্নায়ুবিদ্য ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি বা জটিলতার কারণে ঘটবে এমন কোনো কথা নেই। ফ্লু বা ব্রংকাইটিসের কারণেও অল্প সময়ের জন্যে শ্বাসকষ্ট বা দম নিতে অসুবিধা হতে পারে। এমনকি ভাবাবেগ বা মানসিক কষ্টের কারণেও দম নিতে অসুবিধা হতে পারে। আবার হাঁপানিও হতে পারে দম বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ। অবশ্য এর ওষুধ রয়েছে। কিন্তু হাতের কাছে ওষুধ পাওয়া না গেলে আপনি পিঠের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মালিশ করে রোগীকে দ্রুত আরাম দিতে পারেন।

মালিশ করার এই বিশেষ বিন্দুটি পিঠের ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ডের তৃতীয় 'ডেসাল ভারটেরা'র উভয় পাশে অবস্থিত। এই 'ভারটেরা', বের করার জন্যে রোগীকে বসে মাথা একটু নিচু করতে হবে। তাহলেই আপনি ঘাড়ের নিচে একটু উঁচু হাড়ের মতো দেখবেন। এটিই হচ্ছে শেষ সার্ভিক্যাল ভারটেরা। ওখান থেকে নামতে নামতে আরো তিনটি হাড় নিচে নামলে আপনি তৃতীয় 'ডেসাল ভারটেরা'র, পৌঁছাবেন। বিন্দুটি এই স্তরে মেরুদণ্ডের দুই আঙ্গুল বাম ও দুই আঙ্গুল ডানপাশে অবস্থিত। এই বিন্দুতে বেশ কিছুক্ষণ মালিশ করলে আস্তে আস্তে রোগী আরাম বোধ করবে এবং

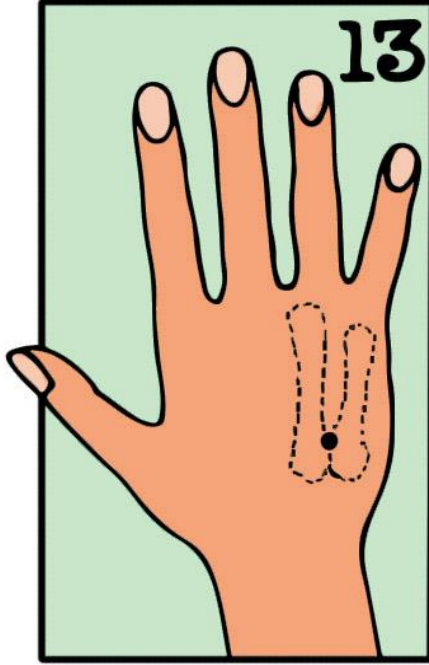
দম স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তবে শ্বাসকষ্ট যদি মারাত্মক হয় দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াই উত্তম। (১১নং চিত্র দেখুন)।

এলাজি



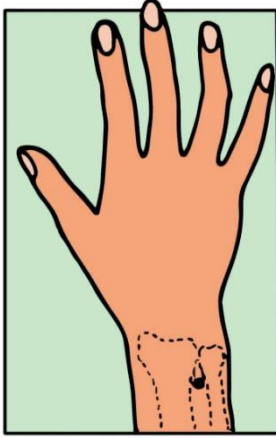
এলাজির চিকিৎসা সবসময়ই জটিল এবং এর জন্যে পেশাগত পরামর্শ নেয়াই ভালো। কিন্তু গরুর গোশত, চিংড়ি মাছ বা কোনোকিছু খাওয়ার ফলে যদি র্যাশ বা শরীরের কোথাও লালচে হয়ে ফুলে ওঠে বা চুলকানি শুরু হয় তাহলে এই অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে। এক্ষেত্রে মালিশ করার বিন্দুটি হচ্ছে হাঁটুর পেছনে ঠিক যেখানে ভাঁজ পড়েছে তার মাঝামাঝি জায়গায়। (১২ নং চিত্র দেখুন)।

পিঠে ব্যথা

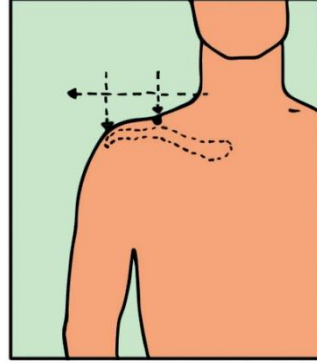


পিঠে মেরুদণ্ডের ব্যথা হতে পারে নানান কারণে। অসুবিধাজনক স্থানে বসা, ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে উঁচুনিচু স্থানে হাটাহাঁটি করে বা জুতার হিলে কোনো অসঙ্গতির কারণে মেরুদণ্ডের পেশীতে ব্যথা হতে পারে।

মানসিক অশান্তি, ভয় বা স্কোভের কারণে মেরুদণ্ডের পেশীতে জড়তার সৃষ্টি হতে পারে। পিছন দিকে পিঠ বাঁকাতে গিয়েও মেরুদণ্ডের পেশীতে টান পড়তে পারে। যে কারণেই হোক না কেন এ ধরনের ব্যথা অবশ্যই কষ্টদায়ক। আপনি একটু মালিশ করে অনায়াসে এই কষ্ট থেকে আরাম পেতে পারেন। এই বিন্দুটি হচ্ছে হাতের উপরিভাগে কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলের হাড়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। (১৩ নং চিত্র দেখুন)।



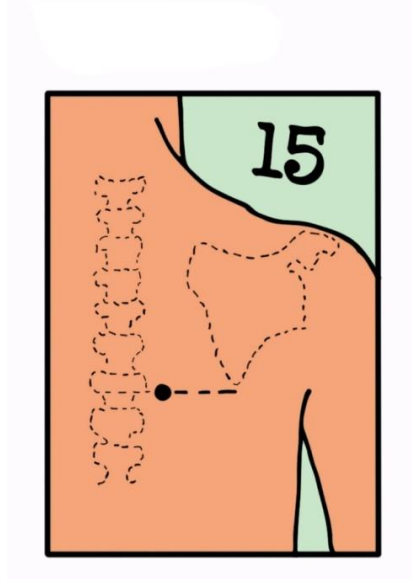
14



ঠাণ্ডা বা ফ্লু'তে আক্রান্ত হলে ঠাণ্ডাবোধ করার সাথে সাথে দুটি বিশেষ বিন্দুতে মালিশ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মালিশ করা প্রয়োজন। প্রথম বিন্দুটি হচ্ছে হাতের কজির উপরে পেছন দিকে ভাঁজের তিন আঙ্গুল নিচে (১৪নং চিত্র দেখুন)।

দ্বিতীয় বিন্দুটি ঘাড়ের গোঁড়া থেকে কাঁধের প্রান্ত সীমার মাঝামাঝি (১৪নং চিত্র দেখুন)।

হিঁকা তোলা



একবার হিঁকা তুললে সহজে তা বন্ধ হতে চায় না। অবশ্য এই অস্বস্তি থেকেও আপনি সহজে মুক্তি পেতে পারেন। তবে সেজন্যে আরেকজনের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কারণ মালিশের বিন্দু দুটি পিঠে অবস্থিত।

এই বিন্দু দুটি মেরুদণ্ডের সপ্তম 'ডটসাল ভারটেরা', বরাবর মেরুদণ্ড কেন্দ্র থেকে দুই আঙ্গুল পাশে অবস্থিত। এই বিন্দু দুটি শোলডার ব্লেডের শেষ প্রান্ত থেকে আনুভূমিক রেখা বরাবর অবস্থিত (১৫ নং চিত্র দেখুন)।



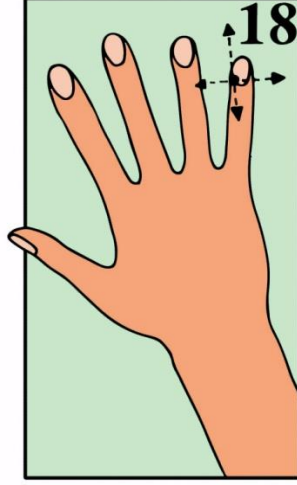
বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। কিন্তু ঘুম আসছে না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। কিন্তু ঘুমাতে পারছেন না।

দুশ্চিন্তা ও টেনশন এত বেশি যে, ঘুম আসার আগেই হয়তো শুনতে পাচ্ছেন ফজরের আজান। ঘুমের জন্যে অসংখ্য মানুষ নানা ধরনের স্লিপিং পিল খাচ্ছেন প্রতিদিন। কিন্তু কাজিফত ফল পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ঘুম আসতে সাহায্য করতে পারে পায়ের দুটি বিশেষ বিন্দু। প্রথম বিন্দুটি বুড়ো আঙ্গুলের নিচে। দ্বিতীয় বিন্দুটি দ্বিতীয় আঙ্গুলের পাশে উপরের দিকে অবস্থিত। আর এই দুটি বিন্দুতে মালিশ করতে হবে খুবই ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে (১৬নং চিত্র দেখুন)।



মাথাব্যথা একটি সাধারণ ঘটনা। শরীরের অন্য যে-কোনো অঙ্গে ব্যথার চেয়ে মাথাব্যথায় মানুষ আক্রান্ত হয় বেশি। মাথাব্যথার কারণ হতে পারে নানাবিধ। ফ্লু থেকে শুরু করে বদহজমের কারণে এটি ঘটতে পারে। আবার চোখে চাপ পড়ার কারণে বা যে কোনো মনোদৈহিক কারণে এটি ঘটতে পারে। মাথার সম্মুখভাগ ব্যথা, একদিকে ব্যথা বা দুই দিকে ব্যথা, ব্যথা যেখানেই হোক না কেন কার্যকরী মালিশ বিন্দু হাতের কজির উপরে অবস্থিত। যেখানে শিরা ধরে নাড়ি গণনা করা হয়, তার থেকে দুই আঙ্গুল উপরে। (১৭নং চিত্র দেখুন)।

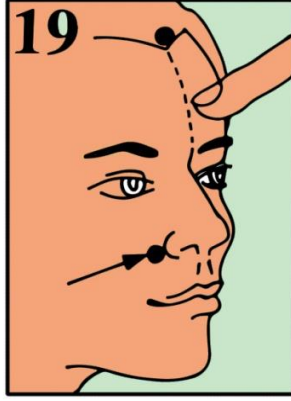
অজ্ঞান হওয়া



নানা কারণেই একজন মানুষ জ্ঞান হারাতে পারে। এ কারণ হতে পারে অত্যন্ত মারাত্মক। যেমন- হৃদরোগে আক্রান্ত হলে। এক্ষেত্রে অবশ্যই সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। আবার তেমন গুরুতর কারণ ছাড়াও একজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ও তাই।

জ্ঞান হারানোর কারণ যাই হোক না কেন জ্ঞান আনার ব্যাপারে কার্যকর দুটি বিন্দুর অবস্থান হচ্ছে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগে নখের গোড়ার পাশে অনামিকার দিকে। রোগীকে শুইয়ে দিয়ে জোরে চাপ প্রয়োগ করে মালিশ করতে হবে। আর নিজে চাপ প্রয়োগ করলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তা করা যেতে পারে (১৮ নং চিত্র দেখুন)।

নাক বন্ধ হলে



সাধারণত ঠান্ডা, ফ্লু বা অন্য কারণে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সাইনাস-এর কারণেও তা হতে পারে। আর শীতকালে সচরাচর সর্দি লেগে অনেকেরই নাক বন্ধ হয়ে যায়।

কারণ যাই হোক না কেন দুটো বিন্দুতে মালিশ করে বেশ আরাম পাওয়া যেতে পারে। প্রথম বিন্দুটির অবস্থান হচ্ছে কপালের উপরিভাগের মাঝখানে চুলের রেখার একটু উপরে। আর চুল যদি পড়ে গিয়ে থাকে তাহলেও এই বিন্দুটি বের করা সহজ। দুই আঙ্গুল মাঝখান দিয়ে সোজাভাবে আঙ্গুল কপালের উপরে নিতে থাকুন। কপালের একেবারে উপরে একটু উঁচু জায়গা পার হওয়ার পরই দেখবেন একটু নিচু জায়গা। বিন্দুটি সেখানেই অবস্থিত (১৯নং চিত্র দেখুন)।

এছাড়াও যদি কোনো নাসা অপরটির চেয়ে বেশি বন্ধ থাকে তাহলে নাসারঞ্জের নিম্নভাগের কোণায় অবস্থিত বিন্দুতে মালিশ করে বেশ উপকার পাবেন। ডান নাসার জন্যে ডান দিকে এবং বাম নাসার জন্যে বাম দিকে মালিশ করবেন (১৯ নং চিত্র দেখুন)।

অধ্যায়-৭

দম নিয়ন্ত্রণ : প্রাণবন্ত হওয়ার প্রক্রিয়া

১

আপনি কি ঠিকভাবে দম নেন? আপনি কি দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখছেন? বিনা পয়সায় পর্যাপ্ত পাওয়া সত্ত্বেও কি আপনার দেহকে এ খাবার থেকে অর্ধেক অভুক্ত রাখছেন? এর উত্তর সম্ভবত 'হ্যাঁ'।

শুধু আপনিই নন শতকরা নব্বই জনই তাই করছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আমরা দেহকে বঞ্চিত রাখছি দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেন থেকে। কারণ ঠিকভাবে দম নিতে না জানায় আমাদের ফুসফুস যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও তা কাজে লাগাতে সক্ষম তার অর্ধেকের কম পরিমাণ অক্সিজেন আমরা সরবরাহ করে থাকি।

অক্সিজেন আমাদের জীবিত রাখে, অক্সিজেন আমাদের প্রাণ। অর্ধেক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেহকে বেদনাদায়কভাবে অর্ধেক জীবিত রাখছি মাত্র, আমাদের প্রাণবন্ততা নামিয়ে আনছি শ্রেফ অর্ধেক। অজ্ঞতার কারণে শতকরা নব্বই জনই অর্ধেক প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছি।

শক্তির প্রধান উৎস অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে রক্তের মাধ্যমে। একজন পূর্ণ বয়স্কের শরীরে গড়ে রক্তের পরিমাণ আড়াই থেকে তিন লিটার। এক হাজার পৃথক পৃথক রুটে এই রক্ত প্রবাহিত হয়ে শরীরের ৭৫ ট্রিলিয়ন সেল বা দেহকোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কোষে সঞ্চিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে এসে ফুসফুসে ছেড়ে দেয়। আবার ফুসফুস থেকে অক্সিজেন নিয়ে রক্ত ছুটে চলে দেহকোষে। এভাবেই দেহকোষের খাবার অক্সিজেন পৌঁছে প্রতিনিয়ত।

যখন আমরা কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকি তখন এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি কোষে গড়ে সাধারণত মিনিটে একবার করে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন পৌঁছে। আর যখন আমরা কাজ করি তখন দৈহিক পরিশ্রম ভেদে প্রতিটি কোষে মিনিটে ৩ থেকে ৬ বার রক্ত চলাচল করে। এই প্রক্রিয়ায় আমাদের হার্ট প্রতিদিন গড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার লিটার রক্ত পাম্প করে। আর এই রক্তকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ করে আমাদের ফুসফুস।

ফুসফুস আমাদের শরীরের বিশেষ ধরনের অঙ্গ। বুকের পাঁজরের নিচেই এর অবস্থান। এটি হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা (ইলাস্টিসিটি) গুণসম্পন্ন অনেকগুলো ছোট ছোট থলির সমন্বয়ে বড় দুটো থলির মতো।

এর নিজস্ব কোনো পেশী নেই। তাই নিজে নিজে ফুলতে বা সঙ্কুচিত হতে পারে না। আমরা বুক ফোলালে তা ফুলে ওঠে। আর পরিপূর্ণভাবে ফোলালে মোটামুটি একটা বাস্কেট বলের সমপরিমাণ বাতাস ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ আমরা বুকের পেশী যত ফোলাতে শিখব ফুসফুসের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ ততই বাড়বে, সেই সাথে বেশি পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দিতে সক্ষম হবো।

আমরা জানি, অক্সিজেন আমাদের শক্তি, অক্সিজেন আমাদের প্রাণ। কিন্তু ঠিকভাবে দম নিতে না পারার কারণে শতকরা নব্বইজনের মধ্যে আলস্য ও নির্জীবতা দেখতে পাই, প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব লক্ষ্য করি।

ম্যাসাচুসেটসের চেস্ট স্পেশালিস্ট ড. রুডি ট্যাডারহিল দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন যে, 'সঠিক দম নেয়া ও ছাড়ার পদ্ধতি সবাই সহজভাবে অর্জন করে না। এটা চর্চা করে অর্জন করতে হয়। ঠিকভাবে দম না নেয়ার কারণে অবসাদ, ক্লান্তি, ব্রংকাইটিস, এজমা, সর্দি, নার্ভাস ব্রেকডাউন প্রভৃতি ঘটতে পারে। তিনি বলেন, 'শতকরা নব্বই জনই সঠিকভাবে দম নিতে পারেন না।

তার মতে, নাক দিয়ে নিয়মিত দম নেয়ার অভ্যাস করতে পারলে অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া আমাদের প্রায়ই গভীর দম (Deep Long breath) নেয়া উচিত। তাহলে আমরা ফুসফুসের তলানিতে আবদ্ধ বাতাস ও বাষ্প পরিষ্কার করতে সক্ষম হবো।

সঠিকভাবে দম নেয়ার গুরুত্ব পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা অনেক পরে অনুধাবন করলেও প্রাচ্যের জ্ঞানীরা দম নিয়ন্ত্রণ বা প্রাণায়াম করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও মিসরের এই দম নিয়ন্ত্রণ বা প্রাণায়াম চর্চা হয়ে আসছে কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই।

অবশ্য এ চর্চা সীমিত ছিল প্রধানত সাধু, সন্ত ও দরবেশদের মাঝে। কারণ তারা জানতেন দমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে দেহ ও মনের ওপরও আসবে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ।

দম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়ালে প্রতিটি দেহকোষ বা সেল পর্যাপ্ত পুষ্টি পেয়ে জর্জরিত হতে পারে। শরীর ও মস্তিষ্ক পূর্ণ ক্ষমতা ও দক্ষতায় কাজ করতে সক্ষম হবে। আপনার ত্বক, চুল, চোখ ও চেহারা সৃষ্টি হবে নতুন উজ্জ্বল ও আভা। আপনি হয়ে উঠবেন আত্মবিশ্বাসী ও প্রাণবন্ত।

অক্সিজেন আপনার প্রাণ। আর আপনি কতটুকু প্রাণবন্ত থাকবেন তা নির্ভর করবে আপনার ওপর। আপনি ইচ্ছে করলে নিম্নে উল্লিখিত পন্থায় দম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণ প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারেন।

উজ্জীবন

দম নেয়ার ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই জনেরই প্রধান ত্রুটি হচ্ছে তারা বুক ফুলিয়ে দম নেন না। দম নেয়ার সময় এদের যা ফোলে তা হচ্ছে পেট। দমের সাথে প্রতিনিয়ত পেট ওঠানামা করায় এদের পেটের পেশী অল্প বয়সেই শিথিল হয়ে যায় এবং পেটে একটা ঢলঢলে ভাব চলে আসে।

আর বুক তেমন না ফোলানোর ফলে পর্যাপ্ত বাতাসও ফুসফুসে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। ফলে এদের দেহকোষ সবসময়ই পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত থাকে। উজ্জীবন প্রণালীতে দম নেয়ার চর্চা নিয়মিত করলেই এই অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

প্রথমে আপনি কোনো আসনে বা চেয়ারে আরাম করে বসুন। চোখ বন্ধ করুন। মেরুদণ্ড রাখুন টান টান সোজা। কল্পনা করুন নাকের সামনে বাতাসভর্তি একটা পেয়লা রয়েছে। পেয়ালার পুরো বাতাসই দমের সাথে ফুসফুসে পাঠাতে হবে। কিন্তু একবার নয়, চারবারে।

এখন কল্পনায় বায়ুভর্তি পেয়ালাকে চার ভাগ করুন। এবার পাত্র থেকে দম নেয়া শুরু করুন। 'হু...., করে নাক দিয়ে চার ভাগের প্রথম ভাগ বাতাস নিন। বুক একটু ফোলান। মুহূর্তমাত্র বিরতি দিয়ে 'হু....., করে নাক দিয়ে দ্বিতীয় ভাগ বাতাস টেনে নিন।

বুক আরো একটু ফুলবে। মুহূর্ত বিরতি দিয়ে 'হু...., করে বাতাসের তৃতীয় ভাগ টেনে নিন। বুক আরেকটু ফুলবে। মুহূর্ত বিরতি দিয়ে 'হু...., করে পেয়ালার বাতাসের শেষ ভাগ টেনে নিন। এখন আপনার বুক পুরোপুরি ফুলে উঠবে।

এবার যতটুকু বাতাস নাক দিয়ে টেনে নিয়েছেন তা মুখ দিয়ে ছাড়তে শুরু করবেন। ছাড়বেনও ঠিক আগের প্রক্রিয়ায় চারবারে। প্রথমে 'ফু....., করে এক চতুর্থাংশ ছাড়ুন। বুক পুরোপুরি ফোলানোর পর যে অবস্থা হয়েছিল তা থেকে কমবে চার ভাগের একভাগ।

মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আবার 'ফু...., করে বুক থেকে দ্বিতীয় ভাগ বাতাস বের করে দিন। মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আবার 'ফু...., করে তৃতীয় ভাগ বাতাস বের করে দিন। বুকের স্ফীতি আরো হ্রাস

পাবে। মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আবার 'ফু...', করে মুখ দিয়ে ফুসফুস থেকে শেষ বাতাসটুকু বের করে দিন। বুকের স্ফীতি কমে তা দাঁড়াবে সবনিম্ন পর্যায়ে।

দম নেয়ার এ প্রণালীটি পড়তে গিয়ে আপনার মনে হবে বেশ জটিল লাগছে। কিন্তু বাস্তবে করতে গিয়ে দেখবেন অনেক সোজা। সোজা লাগার সাথে সাথে মজাও পাবেন প্রচুর। এককথায় যে পরিমাণ বাতাস আপনার ফুসফুস গ্রহণ করতে পারে তা একবারে না নিয়ে মুহূর্ত মুহূর্ত বিরতি দিয়ে চার বারে নেবেন এবং মুহূর্ত মুহূর্ত বিরতি দিয়ে চার বারে তা ছাড়বেন। নেবেন নাক দিয়ে, ছাড়বেন মুখ দিয়ে। আর এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে আপনার লাগবে কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

এভাবে আপনি প্রতিদিন ১০ মিনিট করে দম নেয়া ও ছাড়ার অভ্যাস করুন। ধীরে ধীরে কয়েক মাসের মধ্যেই অবচেতনভাবে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং দম নেয়ার ক্রটিপূর্ণ পদ্ধতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণ-প্রাচুর্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন।

যারা একটু অলস প্রকৃতির তারা সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর বিছানায় শুয়ে শুয়েও এভাবে দম নেয়ার অভ্যাস করতে পারেন। তাতেও একই ফলাফল পাবেন।

আবেশন

দম নেয়ার এ পদ্ধতি শরীর মন শিথিলায়নে বিশেষ উপকারি। শরীর মন শিথিল (Relaxed) করার সময় এই পদ্ধতিতে দম গ্রহণ করার রেওয়াজ রয়েছে। আবেশন পদ্ধতিতে আপনি দম নেবেন নাক দিয়ে। ছাড়বেন মুখ দিয়ে ঠোঁট একটু ফাঁক করে।

দম নেবেন লম্বা করে। বুকের পরিবর্তে ফুলবে উপরের পেট। অর্থাৎ ফুসফুসের চাপ গিয়ে পড়বে ওপরের পেটে। দম নেয়ার সাথে সাথে ওপরের পেট ফুলতে থাকবে। দম ছাড়ার সাথে সাথে পেট চুপসে আসবে।

এক কথায় বলা যায়, নাক দিয়ে একটু ধীর লয়ে লম্বা করে দম নেবেন। দম নেয়ার সময় পেট ফুলবে। আবার ধীরে ধীরে 'ফু', করে দম ছাড়বেন। শরীর-মন শিথিল করার সময় ১০ থেকে ২০ বার আবেশন পদ্ধতিতে দম নিন।

দম নিয়ন্ত্রণের আরো কতগুলো সহজ পদ্ধতি রয়েছে যা চর্চা করলে আপনি নিঃসন্দেহে শারীরিক ও মানসিকভাবে উপকৃত হবেন।

১. চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাত দুটো শরীরের দুপাশে রাখুন। হাতের মুঠো বন্ধ করে ধীরে ধীরে দম নিতে নিতে হাত উপরের দিকে উঠিয়ে মাথার পিছনে নিয়ে রাখুন। আবার ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটো আগের মতো শরীরের দুপাশে রাখুন। এভাবে ২০ বার করুন।

২. যে-কোনো আসনে বা চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। দুই নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে বুক ভরে দম নিন। দম নেয়ার পর ধীরে ধীরে দুই নাসিকা দিয়েই দম ছাড়ুন। যতক্ষণে দম নেবেন তার চেয়ে কিছু বেশি সময় নিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেনও দুই নাসিকায়। ছাড়বেনও দুই নাসিকায়। ১০ বার এভাবে দম নেন।

৩. কোনো আসনে বা চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন। তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুল ভাঁজ করে হাতের তালুতে রাখুন। এবার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাসিকা বন্ধ করে বাম নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। দম নেয়া শেষ হলে ছোট আঙ্গুল দিয়ে বাম নাসিকা বন্ধ করে ডান নাসিকা দিয়ে দম ছাড়ুন। দম ছাড়া শেষ হলে ডান নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিন। দম নেয়া শেষ হলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাসিকা বন্ধ করে বাম নাসিকা দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। বাম নাসিকায় দম নিয়ে ডান নাসিকা দিয়ে ছাড়ার পর এবং ডান নাসিকায় দম নিয়ে বাম নাসিকা দিয়ে ছাড়লে এক প্রস্থ দম নেয়া হয়। এভাবে ১০ বার দম নিন।

৪. হাঁটতে হাঁটতেও দম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আপনি। যারা সকালে বা বিকেলে হাঁটেন তাদের হাঁটায় দম নিয়ন্ত্রণ একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। প্রথম অবস্থায় দম নিতে নিতে ৬ কদম হাঁটুন। আর দম ছাড়তে ছাড়তে ৮ কদম। ক্রমান্বয়ে কদমের পরিমাণ বাড়তে পারেন। অর্থাৎ দম নিতে নিতে ৮ কদম, ছাড়তে ছাড়তে ১২ কদম। আরো পরে দম নিতে নিতে ১০ কদম, ছাড়তে ছাড়তে ১৬ কদম। এতে আপনি হাঁটার উপকারের সাথে সাথে পাবেন দম নিয়ন্ত্রণের উপকার। (দৈনিক ইন্ডোফাকে প্রকাশিত)

২

স্বর্ণ-ঈগল

আমাদের শতকরা ৯০ জনই সঠিকভাবে দম নিতে জানেন না। ফলে দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাবার অক্সিজেনেরই ঘাটতি থেকে যায় আমাদের দেহে। আমরা প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠতে পারি না। অথচ সচেতন চেষ্টায় সামান্য ক'টি কৌশল শিখেই প্রকৃতির অফুরন্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন সজীব, প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত। শাহিন বা স্বর্ণ-ঈগল হচ্ছে গভীরভাবে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার ব্যায়াম।

নিরাময় ও প্রশান্তি

৭৫

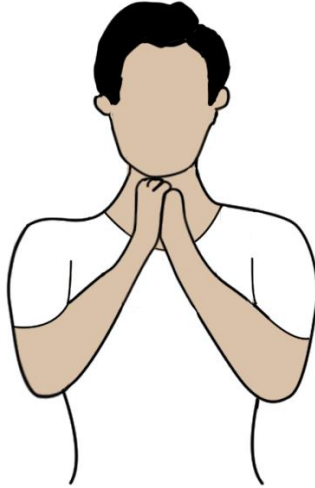
স্বর্ণ-ঈগল অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে গভীর দম নেয়া-

০ ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ায়

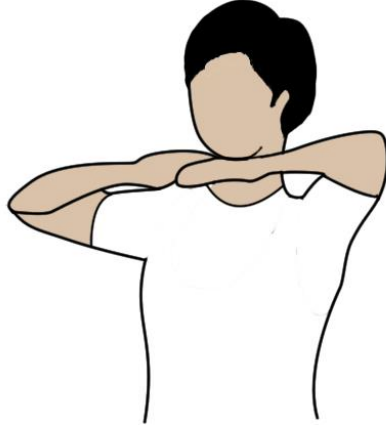
০ ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে

০ মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, মন শান্ত রাখে

১. সোজা হয়ে দাঁড়ান। দুহাতের আঙ্গুল পরস্পরের খাঁজে ঢুকিয়ে সেগুলো থুতনির নিচে রাখুন।
দুহাতের কনুই বকের দুপাশে প্রায় লেগে থাকবে।



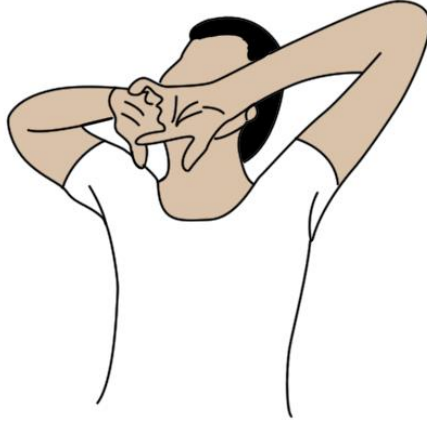
২. এখন মুখ বন্ধ রেখে নাক দিয়ে দম নিতে শুরু করুন এবং গলার ভেতরের পেছনের অংশে বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করুন। শুরু থেকেই দুপাশের কনুই দুদিকে ছড়িয়ে উপরের দিকে ওঠাতে থাকুন।



৩. দম নিতে নিতে কনুই দুটো যতটুকু সম্ভব উপরে তুলুন। জড়ো করা হাতের চেটোয় চিবুক দিয়ে চাপ রাখুন। অনুভব করুন দম নেয়ার সময় আপনার স্বরতন্ত্রী কাঁপছে।



৪. দম নিতে নিতে আপনার মাথা আস্তে আস্তে পেছনে হেলিয়ে দিন। দম নেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন ৬ পর্যন্ত গুণে।



৫. মাথা পেছনে হেলার সময় আপনার কনুই মুখ বরাবর আস্তে আস্তে কাছে এসে পরস্পরকে স্পর্শ করবে। কঙ্গি থেকে কনুই পর্যন্ত দুই হাত এবং মুখ এক লাইনে রাখার চেষ্টা করুন।



৬. এবার মুখ একটু ফাঁক করে দম ছাড়তে ছাড়তে মাথা ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে আসুন। এসময় কনুই দুটো একসাথে বুকের ওপর হালকা চাপ সৃষ্টি করবে এবং সব বাতাস বেরিয়ে যাবে।



সাত পর্যন্ত গুণে দম ছাড়া সম্পন্ন করুন। দম নেয়া সম্পন্ন হবে ৬ গোণার পর। দম ছাড়া সম্পন্ন হবে ৭ গোণার পর। এবার দুহাত নামিয়ে একটু বিশ্রাম নিন এবং প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করুন।

দম নিয়ন্ত্রণ বা প্রাণায়ামের আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো জটিল এবং তা কোনো গুরু বা প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই করা উচিত। আর হ্যাঁ, ভরপেট খাবার খাওয়ার ২/৩ ঘণ্টার মধ্যে দম নিয়ন্ত্রণের চর্চা করা উচিত নয়। এছাড়া যখনই আপনি ক্লান্তি অনুভব করেন তখন চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে দম নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন (Deep slow breathing)।

৪/৫ বার বা ৮/১০ বার এভাবে দম নিন। ঘরের ভ্রূইংরুমে বসে বা অফিসের চেয়ারে বসে এমনকি নামাজ শুরু করার আগেও আপনি এভাবে দম নিতে পারেন। দেখবেন অবসাদ চলে গেছে।

শরীরের প্রধান খাবার অক্সিজেন। আর প্রকৃতিতে তা রয়েছে অফুরন্ত। অকৃপণভাবে নিজের দেহকোষকে অক্সিজেনের পুষ্টি দিন। জীবনকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর করে তুলুন। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে উজ্জীবিত হোন।

অধ্যায়-৮

মেডিটেশন-এর শক্তি

Meditation আর Medicine দুটো শব্দই এসেছে গ্রীক Mederi শব্দ থেকে। Mederi শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাময়। আর Medicine এবং Meditation দুটোই ব্যবহৃত হয় নিরাময়ের কাজে। মেডিটেশন মূলত নিরাময় করে দৈহিক অসুবিধা। আর মেডিটেশন নিরাময় করে দেহ মনের সকল অসুবিধা।

মেডিটেশন শুধু দেহ মনকে প্রশান্ত করে নতুন শক্তিতেই উজ্জীবিত করে না, মেডিটেশন এর পথ ধরেই ব্যক্তিচেতনা যুক্ত হয় মহাচেতনার সাথে। মানুষ তখন আর নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা বলে ভাবে না, বরং ভাবে মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে।

তাই তার কোনো সমস্যাও নিজের সমস্যা থাকে না, হয়ে পড়ে মহাপ্রকৃতির সমস্যা। আর তার সমাধানও করে মহাচেতনা। তাই দেখা যায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যা অসম্ভব মনে হয়, যে সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না, মেডিটেশন করে সহজেই তার সমাধান পাওয়া যায়, অনেক অসম্ভবই হয়ে ওঠে সম্ভব।

তবে আপনার সমস্যার সমাধান কতটুকু পাবেন তা নির্ভর করবে আপনার ধ্যানমগ্নতা বা মেডিটেশন লেভেল এর গভীরতার ওপরে। অর্থাৎ সহজ ভাষায় আপনি মনোযোগের শক্তিকে কতটুকু একাগ্রভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন তার ওপর।

মেডিটেশনে একাগ্র মনোযোগের শক্তিই (Power of mental concentration) হচ্ছে আসল শক্তি। কারণ চূড়ান্ত একাগ্রতা ছাড়া একাত্ম হওয়া যায় না কোনোকিছুর সাথেই। আর মহাপ্রকৃতির শক্তির সাথে একাত্ম হতে না পারলে আপনার সমস্যা সমাধানে মহাচেতনের সহযোগিতা পাবেন কেমন করে!

মেডিটেশন-এর মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে একাগ্রতা, একাত্মতা। একাত্মতা প্রতিটি কাজকেই ধ্যানে বা মেডিটেশনে পরিণত করে। আর কাজ ধ্যানে পরিণত হলেই আসে সাফল্য খ্যাতি। যেমন- আমাদের জুয়েল আইচ।

তিনি যখন যাদু দেখান তখন যাদু আর জুয়েল আইচের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। যাদুর বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। যাদুর মাঝে পরিপূর্ণরূপে মিশে যান তিনি। আর তাই তার

যাদু দেখতে দেখতে দর্শকরা তন্ময় হয়ে যায়। আর সে কারণে তিনি পেয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তিনি পরিণত হয়েছেন আমাদের অহঙ্কারে। তার মতো ধ্যানমগ্ন হতে পারলে আপনার ক্ষেত্রে, আপনার জীবনেও আসতে পারে একই মাত্রার সাফল্য।

ধ্যান অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করে তার আরেকটি উদাহরণ আমাদের মধ্য থেকেই দেয়া যায়। ডক্টর এসএম সালাহউদ্দীন- তার মুখেই শোনা তার নিজের জীবনের ঘটনা। ১৯৬৮ সালে ২৮ এপ্রিল তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। ভর্তি হয়েছেন ডা. মেহেরুল্লাহসার ক্লিনিকে।

প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসছে। ড. সালাহউদ্দীন অপেক্ষা করছেন ওয়েটিং রুমে। এমন সময় ডাক্তার এসে উৎকর্ষিতভাবে বললেন, দুঃখিত সালাহউদ্দীন সাহেব। বাচ্চার একটা হাত বেরিয়ে এসেছে। এখন অপারেশন করার সুযোগ নেই। বাচ্চা তো বাঁচানো যাবেই না, মায়ের যে শেষ পর্যন্ত কী হয় তাও বলা যাচ্ছে না।

প্রিয় সহধর্মিনীর জীবনসংশয়ের কথা শুনলে কার পক্ষে অবিচল থাকা সম্ভব! মানুষ তো তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তিনি মাথা ঠান্ডা রেখে তৎক্ষণাৎ সোফার ওপরে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন, একাত্ম হলেন মহাচেতনার সাথে।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে কোনো খেয়াল নেই। তিনি যখন আবার জাগ্রত অবস্থায় ফিরে এলেন, তখন ডাক্তার তার কাঁধ ধাক্কা দিচ্ছেন। বলছেন, আরে সালাহউদ্দীন সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি। এদিকে তো অলৌকিক কাণ্ড!

একটু নাড়াচাড়া করতেই বাচ্চার হাত আবার জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে। এরকম ঘটনা আমার ডাক্তারি জীবনে আর কখনো দেখিনি। যদিও বাচ্চাকে বাঁচানো যায়নি, তবুও প্রসূতি পুরোপুরি সুস্থ।

মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্নতা বা একাগ্র ধ্যানের পথে প্রধান বাধাই হচ্ছে মন। প্রশ্ন করতে পারেন কীভাবে? একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ধরুন আপনার কাছে মোট ১০০ ভাগ মনোযোগ আছে। যখন মন কোনোকিছু ভাবে বা কোনোকিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয় তখনই মনোযোগ বা **Mental Energy** এর একটা অংশ ব্যয় হয়।

আর যখন আপনার চিন্তা বিঘ্নিত হয় বা অন্য কোনো চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে তখন **Mental Energy** এর অপচয় হয়।

এখন ধরা যাক আপনি কোনো একটা লেখার কাজ নিয়ে বসেছেন। কাজ করতে গিয়ে মনে হলো বসটা ঠিক জুতসই হয়নি, একটু নড়েচড়ে বসলেন। আর এটা করতে গিয়ে আপনার মনোযোগের একটা অংশের অপচয় হলো। আপনি আপনার দৈহিক টেনশন সম্পর্কে সজাগ না থাকলেও পেশীর যে-কোনো উত্তেজনা আপনার **Mental Energy** এর অপচয় ঘটাবে। ধরুন এভাবে ১৫ ভাগ মনোযোগের অপচয় ঘটলো।

এবার আবার কল্পনা করুন- লিখতে বা কাজ করতে বসে একটু পরেই একঘেয়েমি লাগতে শুরু করল। আপনার মনের একটা অংশ কাজ করতে চায়, আরেকটা অংশ কাজ করতে চায় না। আপনার আরো ১৫ ভাগ মনোযোগের অপচয় ঘটল।

এখন কল্পনা করুন- আপনার চিন্তা লেখা বা কাজ উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াতে শুরু করল। আপনি হয়তো চিন্তা করতে লাগলেন ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার কথা বা ভাবছেন স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনার কথা বা ভাবছেন নিজের বোকামির কথা অথবা ভাবছেন স্ত্রীর জন্যে তাস খেলায় হেরে যাওয়ার বিষয় বা ধারদেনার কথা বা কয়েকদিন আগে দেখা চলচ্চিত্রের কথা। আরো ১৫ ভাগ মনোযোগের অপচয় ঘটল।

এবার কল্পনা করুন- বাথরুম বা পাকঘরের কল ভালোভাবে বন্ধ না করে কাজের মেয়ে কোথাও গেছে। আপনাকে উঠে গিয়ে কল বন্ধ করতে হবে।

তা না হলে টপ টপ শব্দে আপনার মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্তির জন্ম দিতে পারে। আর তেমন হলে দেখা যাবে যে- কোনো মনোযোগই অবশিষ্ট থাকছে না।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা **Mental Energy**-এর শুধুমাত্র অংশবিশেষই ব্যবহার করে থাকি। কারণ আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সবসময় কল্পনা, প্রত্যাশা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জড়িয়ে থাকি। একই সাথে আমাদের মস্তিষ্ক বহু ধরনের কাজ করে চলে। মনের একটা অংশ হয়তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, অন্য অংশ হয়তো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। মনের এক অংশ হয়তো কথা বলছে অপর অংশের সাথে। কথা ও চিত্রকল্পের তোড়ে চিন্তা হয়ে যাচ্ছে অগোছালো।

ফুটবল মাটিতে পড়ে যেমন অপ্রত্যাশিত গতিতে উপরে লাফ দিয়ে ওঠে তেমনি আমাদের চিন্তাও বেশিরভাগ সময় ফালতু লাফালাফি করে। ১০০ ভাগ মনোযোগের বেশিরভাগই অপচয় ঘটে আমাদের জীবনে।

দার্শনিক প্লেটো মনকে তুলনা করেছেন এমন একটি জাহাজের সাথে যার নাবিকরা বিদ্রোহ করে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং পাঞ্জেরীকে বন্দী করে জাহাজের খোলার ভেতর কেবিনে আটকে রেখেছে।

নাবিকরা নিজেদেরকে মনে করছে মুক্ত স্বাধীন। যখন যে দিকে যার ইচ্ছা তখন সেদিকে সে জাহাজ চালাচ্ছে। কারণ নাবিকরা কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে পারে নি। আর লক্ষ্য ঠিক করে থাকলেও সেদিকে জাহাজকে পরিচালিত করতে পারছে না।

প্লেটো লিখেছেন, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নাবিকদের বিদ্রোহ দমন করে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও পাঞ্জেরীকে মুক্ত করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তাহলেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার স্বাধীনতা লাভ ও সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ক্রমাগত সঙ্গতিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব হবে। মনের মুহূর্তের খেয়ালিপনার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পারলেই সত্যিকার স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব।

মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্নতার প্রাথমিক লক্ষ্যও তাই। মনের খেয়ালিপনা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাওয়া।

প্রথম স্তর হচ্ছে একই সময়ে একটাই চিন্তা বা কাজ করা। অর্থাৎ কোনোকিছু নিয়ে ভাবলে শুধু সেটা নিয়েই ভাবা, অন্যকিছু নিয়ে না ভাবা। নাচলে শুধু নাচবেনই। নাচা নিয়েও চিন্তা করবেন না। চূড়ান্ত পর্যায়ে মেডিটেশন হচ্ছে কিছুই না করা। শুধু চেতনায় মগ্ন থাকা। চীনা দার্শনিক লাও সু আড়াই হাজার বছর আগে খুব চমৎকার ভাবে একথাটি বলেছেন :

In the pursuit of learning

One knows more everyday

In the pursuit of tao one does less everyday,

One does less and less untill

One does nothing at all,

and when one does nothing at all,

There is nothing that is undone.

জ্ঞান অনুসন্ধানকালে একজন প্রতিদিন বেশি কিছু জানে,

আর ধ্যানে (Tao) প্রতিদিনই কম পরিশ্রম করে,

শ্রম কমাতে কমাতে সে একসময় কিছুই করে না,

আর যখন একজন কিছুই করে না, তখন করার কিছু বাকিও থাকে না।

অর্থাৎ তখন আপনি মহাচৈতন্যে নিমগ্ন হন। আপাত বিরোধী বক্তব্য হলেও ধ্যানমগ্নতার বেলায় এ কথাটি যে কত সত্য তা আমরা একটু পরেই উপলব্ধি করব।

প্লেটো নাবিকদের বিদ্রোহ দমন করার কথা বলেছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ দমন যে কত কঠিন তা মেডিটেশন করতে বসলেই টের পাওয়া যায়। বিদ্রোহী নাবিকরা বিভিন্নভাবে শৃঙ্খলাকে এড়িয়ে যেতে চাইবে। প্রথমে বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভেসে আসবে। নামাজে দাঁড়িয়ে যে অবস্থা হয়, এখানেও সেই একই অবস্থা।

রাজ্যের যত সব কথা, স্মৃতি সব ফন্সুধারার মতো প্রবাহিত হতে শুরু করে। দেখা গেল যেখানে নাক বা কান চুলকায় নি, সেখানে চুলকানি অনুভব করলেন, মনের অজান্তেই হাত চুলকানোর কাজে লেগে গেলো। একটু নড়েচড়ে না বসলে যেন আর পারা যাচ্ছে না, নড়েচড়ে বসলেন।

অথবা রাজ্যের যত ক্লান্তিতে নিজের অজান্তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগলেন, চৈতন্যে নিমগ্ন হওয়ার পরিবর্তে তন্দ্রায় নিমগ্ন হলেন।

অথবা কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলেন, কোনো সমস্যার সমাধান হঠাৎ পেয়ে আনন্দিত হলেন। নানা ধরনের অনুভূতি এসে কাজ করতে শুরু করল।

হয়তো আপনি চাইছেন একটা নির্দিষ্ট সূত্র নিয়ে ভাবতে, তার পরিবর্তে আপনি দেখতে থাকলেন রঙের মেলা, মনে হলো হালকা হয়ে গেছি ভারি হয়ে গেছি। কত ধরনের গন্ধ, বর্ণ, আলো, রঙ যে আসতে পারে তার ইয়ত্তা নেই।

হঠাৎ আলো দেখে বা কোনো ছবি দেখে ভাবলেন সুবহানাল্লাহ। পেয়ে গেছি, আমার হয়ে গেছে। আসলে কিছুই হয় নি। শুধুমাত্র ধ্যানের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আপনি যদি মেডিটেশন এর জন্যে ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে থাকেন, তবে ১৫ মিনিট পর মনে হবে মন আপনার ইচ্ছাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছে। আপনার শরীর যদি আপনার ইচ্ছার সাথে এর অর্ধেক পরিমাণও

অসহযোগিতা করত, তাহলে ঢাকার কোনো রাস্তা পার হয়ে আপনি সশরীরে বাসায় ফিরতে পারতেন না।

মনোযোগের অনুশীলনী

আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ এ অনুশীলন- মাত্র দুমিনিট ঘড়ির কাঁটার প্রতি অখণ্ড মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে থাকা। ঘড়ির কাঁটা ছাড়া অন্য কোনো কিছু না ভাবা। অনুশীলনের পদ্ধতিটাও খুব সহজ।

১. বড় সেকেন্ডের কাঁটা রয়েছে এমন একটি দেয়াল বা টেবিল ঘড়ির সামনে বসুন। টেবিল বা দেয়াল ঘড়ির অভাবে বড় সেকেন্ডের কাঁটায়ুক্ত হাতঘড়ি দিয়েও কাজ চলতে পারে।

২. শরীর শিথিল (Relax) হতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিন। সবকিছু থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একাগ্র হোন। মানসিক প্রস্তুতি শেষ করার পর সেকেন্ডের কাঁটার গতির ওপর আপনার মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

৩. মাত্র দুমিনিটের জন্যে আপনার সচেতনতাকে সীমিত রাখুন সেকেন্ডের কাঁটার গতির ওপর। এমনভাবে মনোযোগ দিন যে, সেকেন্ডের কাঁটা ছাড়া এই মহাবিশ্বে যেন আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

৪. অন্য কোনো চিন্তা ঢুকে যদি মনোযোগের সুতো ছিঁড়ে ফেলে তাহলে থামুন। আলতোভাবে মনোযোগ সেকেন্ডের কাঁটায় ফিরিয়ে আনুন।

৫. পাক্কা দুমিনিট আপনার মনোযোগ বজায় রাখতে চেষ্টা করুন।

বইটা পাশে ঠেলে রাখুন। অনুশীলন শুরু করুন।

কেমন লাগল আপনার? মনোযোগ দেয়া কি প্রথমে সহজ হয়েছিল? পরে তা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়? আপনি কি তখন অন্য কোনো চিন্তা করছিলেন? অথবা কি ভেবেছেন কত সুন্দরভাবে অনুশীলন করছেন? বা একদম অনুশীলন হচ্ছে না?

দুমিনিটে আপনার মনোযোগের অবস্থা যাই হোক না কেন, আপনি লক্ষ করেছেন আপনার মন অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চেয়েছে।

তাহলে এখন কী করবেন?

শরীরের সাথে জোর খাটানো যায়, মনের সাথে তো জোর করা যায় না। মনকে কোনো বিশেষ কাজে লাগানোর জন্যে যত জোর করবেন, তখন দেখা যাবে যে মনোযোগ বজায় রাখা হচ্ছে নিরাময় ও প্রশান্তি

আরো কঠিন। এ যেন গাধাকে পথ হাঁটানো। গাধাকে টানুন আর ঠেলা দিন, গাধা হাঁটতে চাইবে না। যত জোরে টানবেন, গাধা তত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরিণতিতে নিজেকেই গালমন্দ করার মধ্য দিয়েই ঘটবে টানাটানির পরিসমাণ্ডি।

পক্ষান্তরে গাধাকে আগ্রহী করে তুলুন। তার নাকের সামনে একটা মুলা বা গাজর ঝুলিয়ে দিন। গাধা তখন আপনার কাঙ্ক্ষিত পথে অবলীলায় ছুটতে থাকবে।

মনোযোগের মূল উৎস হচ্ছে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। একটা রহস্য উপন্যাস বা একটা থ্রিলার ছবি দেখার জন্যে মনকে জোর করে মনোযোগ দিতে বলতে হয় না।

আবার আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তেমন ব্যাপারেও সহজাত আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। আগ্রহ সৃষ্টি হলে মনোযোগের অভাব হয় না। মুলা যেমন গাধাকে পথ দেখায় আগ্রহ তেমনি মনোযোগের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

তাই আপনি মেডিটেশনের মাধ্যমে মনোযোগ ও একাগ্রতা কেন বৃদ্ধি করতে চান, আগে সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করুন।

কী চান? কোন ধরনের সাফল্য চান? কোটিপতি হতে চান? খ্যাতি চান? জ্ঞান চান? চেতনার স্তরকে উন্নত করতে চান?

যা চান তা পেলে আপনার জীবনযাত্রায় কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তা ভিজুয়ালাইজ করুন। তাহলেই আপনার মধ্যে আসবে আগ্রহ ও উদ্দীপনা। এই উদ্যমই আপনাকে পৌঁছে দেবে মেডিটেশনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে।

শর্ত

মেডিটেশন করার জন্যে শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিকতার মোটামুটি ৭টি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। এই ৭টি শর্ত পূরণ হলে মেডিটেশন করা বা ধ্যানমগ্ন হওয়া সহজ হবে-

১. কোলাহলমুক্ত শান্ত স্থান।

২. দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য ও আরাম।

৩. আরামে বসা।

৪. শিথিলায়ন/Relaxation।

৫. ধীর লয়ে দম।

৬. মনোযোগ বিন্দু বা বস্তু।

৭. একাগ্র সচেতনতা।

১. শান্ত স্থান

মেডিটেশনের জন্যে আপনার ঘরের একটি নিরিবিলি রুম বেছে নেন। প্রতিদিন একই ঘরে একই স্থানে মেডিটেশন করতে বসুন।

রুমটি এমন হবে যেখানে কোলাহল বা হট্টগোলের আওয়াজ সবচেয়ে কম যায়, আলোর ঝলকানি কম। ওয়েলডিং বা সার্চ লাইটের হঠাৎ হঠাৎ আলো যেখানে এসে পৌঁছায় না।

নিশ্চিত হতে হবে মেডিটেশনকালে অন্য কেউ এসে বিরক্ত করবে না। টেলিফোন প্লাগ থেকে খুলে রাখুন। অথবা আওয়াজ কমিয়ে এমনভাবে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন যে, টেলিফোন বাজার কোনো আওয়াজ আপনার কানে না আসে। দরজা বন্ধ থাকলেও ঘরে যাতে মৃদু আলো এবং পর্যাপ্ত বাতাস থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

অবশ্য আওয়াজ বা আলোর ব্যাপারে কারো কারো সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি। কেউ কেউ বাসে, ট্রেনে, পার্কে, বা রেস্টুরেন্টে বসেও ধ্যানস্থ হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তবে বেশিরভাগ মানুষের জন্যেই একটা শান্ত কোলাহলমুক্ত রুম সবচেয়ে ভালো।

২. দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য ও আরাম

দৈহিক সামর্থ্য ও সুস্থতা মেডিটেশনের এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব শর্ত। শারীরিক রোগ, দৈহিক ব্যথা বা মানসিক বেদনা মেডিটেশনে নিঃসন্দেহে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। পর্যাপ্ত শারীরিক শক্তি না থাকলে আপনি যেভাবেই বসেন না কেন মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারবেন না। একটু পরেই দেখবেন মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেছে। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। চেয়ারে বসে থাকলে দেখবেন পিঠ পেছন দিকে হেলান দিয়ে ফেলেছে।

তাহলে আপনার সজাগতা কমে যাবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মেডিটেশন বিঘ্নিত হবে। কারণ আমাদের মেরুদণ্ডই মস্তিষ্কে সজাগ রাখে। যে মুহূর্তে মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেল, আপনি পেছনে কোনোকিছুর সাথে হেলান দিলেন, আপনার সজাগতা হ্রাস পেল, আপনি বিচ্যুত হলেন।

তাই মেডিটেশন বা ধ্যানে সফল হতে হলে শরীরকে সুস্থ, সুন্দর ও সুঠাম করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ কারণেই আমাদের যোগী, সাধু, দরবেশরা ধ্যান বা মেডিটেশনের পাশাপাশি শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে গুরুত্ব দিতেন।

ভারত, চীন, মিশরে যোগ ব্যায়ামের উদ্ভব হয়েছে এই প্রয়োজন থেকেই। মেডিটেশন শুরুর আগে গোসল করে নিলে খুব ভালো। তা না হলে হাত মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নেন। নাক পরিষ্কার করে নেন। ভালোভাবে কুলি করে মুখের ভেতরটা পরিষ্কার করে নেন। চোখে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দেন। মূত্রথলি ফাঁকা করে ফেলুন। সম্ভব হলে মলাশয়ও ফাঁকা করুন।

শরীরের পোশাক থাকবে হালকাভাবে জড়ানো। বেল্ট, টাই প্রভৃতি ঢিলা করে নেন। অবশ্য শীতের দিনে গায়ে পর্যাপ্ত কাপড় রাখুন। জুতো খুলে ফেলুন।

মেডিটেশনের সময়

মেডিটেশনে ভালো ফল পেতে হলে নিয়মিত দিনে একবার বা দুবার অনুশীলন করুন। বেশিরভাগ লোকের জন্যে দিনে দুবার অনুশীলনই ভালো ও ফলপ্রসূ। ভরপেট খাবার গ্রহণের পর কমপক্ষে ২ ঘণ্টা সময় পার হতে দেন। দিনে দুবার মেডিটেশন করে ভালো ফল পেতে হলে সকালে নাস্তার আগে ও রাতে খাওয়ার আগে অনুশীলন করুন, আর দিনে একবার করলে দুপুরে খাওয়ার আগে বা সকালে নাস্তার আগে করাই ভালো। ২ বার মেডিটেশনের মাঝে ৬ ঘণ্টা বিরতি দেন।

কতক্ষণ করবেন

সংসারী মানুষের জন্যে এক সেশনে ২০ মিনিট কাটানো ভালো। তবে ১০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত মেডিটেশনও কার্যকর। যারা প্রথম শুরু করবেন, ঠিক করে নেন, কতক্ষণ করবেন। সেভাবে ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখুন। অবশ্য কিছুদিন করার পর আর ঘড়ির দরকার হবে না। আপনার দেহ ঘড়িই বলে দেবে কখন ২০ মিনিট হলো। মেডিটেশন শেষ করার পর চোখ মেলে তাকিয়ে ১ মিনিট শান্তভাবে বসে তারপর আপনি উঠে দাঁড়াবেন।

৩. আরামে বসা

মেডিটেশনের জন্যে আরামে বসা অত্যন্ত জরুরি। যদিও পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, সুখাসন, জাজেন বা বজ্রাসনে বসে মেডিটেশন বা ধ্যানমগ্নতা সহজ, তবুও এ আসনগুলো পুরোপুরি রঙ করার জন্যে কিছুটা অনুশীলন প্রয়োজন। যারা এ আসনগুলোয় অভ্যস্ত তাদের ধ্যানের ক্ষেত্রে এটা একটা প্লাসপয়েন্ট।

যাই হোক চেয়ারে বসে করলেও মেডিটেশন পুরোপুরি ফলপ্রসূ ও কার্যকর হতে পারে। যদি তিনটি শর্ত পালিত হয় (১) মেরুদণ্ড টানটান থাকবে, কিন্তু শক্ত নয় (২) শরীরে অশ্বস্তি লাগবে না (৩) শরীর অবশ্যই অনড় অচল হতে হবে। চেয়ারে এমনভাবে বসবেন যেন এটা Well balanced হয়। পা মাটিতে লেগে থাকবে। পিঠ কখনোই চেয়ারের পেছনে হেলানো থাকবে না। হাত দুটো থাকবে হাঁটুর ওপর। মুখ বন্ধ থাকবে। জিভ থাকবে নিচের মাড়িতে দাঁতের গোড়ায়।

৪. শিথিলায়ন

শরীরকে পুরোপুরি শিথিল, অনড় ও অচল করে তুলতে হবে।

৫. ধীর লয়ে দম (Slow deep abdominal breathing)

মেডিটেশনকালে সবসময় দম নেবেন নাক দিয়ে, দম ছাড়বেনও নাক দিয়ে। অবশ্য কোনো কারণে নাক বন্ধ থাকলে অন্য কথা। দম নেবেন ধীরে কিন্তু গভীরভাবে, ওপরের পেটে। ধীরে ধীরে গভীর ভাবে দম নেবেন ধীরে ধীরে গভীর ভাবে দম ছাড়বেন। ধীর লয়ে দম দেহ মনকে দ্রুত প্রশান্ত করে। এই প্রশান্তির কারণে দেহের অক্সিজেন গ্রহণ ২০% কমে যায়। চর্চার পর আপনা আপনিই মেডিটেশন কালে দম ধীর হয়ে যায়।

৬. মনোযোগ বিন্দু বা বস্তু (Meditation Object)

যে-কোনো কিছুই মনোযোগ বিন্দু হতে পারে। যেমন :

১. ফুল, একখণ্ড নুড়ি, নীলাকাশের একটা অংশ, পানিতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বা যে-কোনো বস্তু।

২. আওয়াজ, সুর, সঙ্গীত, ঘড়ির শব্দ, নৈশব্দের শব্দ (Sound of silence)

৩. একটা অনুভূতি, প্রেম, ভক্তি।

৪. মন্ত্র বা জিকির বা বাদ্য।

৫. দম অবলোকন।

এমন যে-কোনো কিছু যাতে মনোযোগ দেয়া যায় এবং যা মেডিটেশন চলাকালীন সময়ে সেখানে থাকবে। অন্যদিকে মনোযোগ চলে গেলে, যাতে মনোযোগকে সেখানে ফিরিয়ে আনা যায়।

৭. একাগ্র সচেতনতা (Poised Awareness)

মেডিটেশনে মনোযোগ ও সচেতনতা একসাথে কাজ করে এবং এ দুটোর কাজ সমন্বিত করাটাই সবচেয়ে জরুরি। ক্যামেরা দিয়ে একটা ভালো ছবি তুলতে হলে লেন্স এর এপারচার ও শাটার স্পীড যেমন সমন্বিত হতে হয়, তেমনি মেডিটেশনের ক্ষেত্রেও। মেডিটেশনে মনোযোগরূপী লেন্সকে আমরা নির্ধারিত বস্তুর ওপর নিক্ষেপ করি। চেতনা তা গ্রহণ করে। মনোযোগরূপী লেন্স সবসময়ই মেডিটেশন বিন্দু বা বস্তু থেকে সরে যেতে চায়।

আমাদের কাজ হচ্ছে ধৈর্যের সাথে মনোযোগকে ঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনা। ধ্যানযোগে মনোযোগই ধ্যানে রূপান্তরিত হয়। তখন কোনো চেষ্টা ছাড়াই মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং চেতনা স্বচ্ছরূপ লাভ করে। মনোযোগ অন্যদিকে যেতে নিলেই তাকে আস্তে করে মেডিটেশন বিন্দু বা বস্তুতে নিয়ে আসতে হয়। চেতনাকে (Awareness) গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মেডিটেশন অবজেক্ট সম্পর্কে সচেতনতা ও উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

আর এই সচেতনতা বৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ধ্যানী আর ধ্যানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, সাবজেক্ট আর অবজেক্টের পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়। তখন শুধু অবশিষ্ট থাকে স্বচ্ছ সচেতনতা। মহা চেতন্যের সাথে একাত্ম হয়ে ধ্যানী লাভ করেন অনাবিল শান্তি।

অধ্যায়-৯

রোগ নিরাময়ে মেডিটেশন

‘মেডেরি, অর্থাৎ নিরাময় শব্দ থেকেই মেডিটেশন শব্দটির উৎপত্তি। এই নিরাময় ক্ষমতার কারণেই অতীতে মুনি ঋষি-দরবেশদের ওষুধপথ্যের দ্বারস্থ হতে হতো কম। আর এখনো যারা সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি মেডিটেশন করেন অন্যদের চেয়ে অল্প সময়ে ও সহজে তারা রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেন।

মেডিটেশনের এই নিরাময় ক্ষমতার সাম্প্রতিক নজির সিঙ্গাপুরের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বি জি লী সিয়েন। বিখ্যাত সাময়িকী এশিয়া উইকের ৩০ জুন, ১৯৯৩ সংখ্যায় ‘দি পাওয়ার অব মেডিটেশন, নিবন্ধে বলা হয়- বি জি লী সিয়েনের লিমফেটিক ক্যান্সার ধরা পড়ে গত নভেম্বরে।

এরপর তিনি মেডিটেশন করতে শেখেন। ১৮ সপ্তাহের কেমোথেরাপি এবং মেডিটেশনের পর ডাক্তাররা তাকে ক্যান্সারমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। রিপোর্টে বলা হয়, ডাক্তাররা এখন অধিক হারে রোগীদের মেডিটেশন করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

সিঙ্গাপুরের টিউমার বিশেষজ্ঞ ডা. ইয়াপ বো সেঙ বলেন, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মেডিটেশন টেনশন থেকে মুক্তি দেয়, রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং উচ্চরক্তচাপ হ্রাস করে। শতকরা ৭০ ভাগ রোগ নিরাময়েই মেডিটেশন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা করতে পারে।

মেডিটেশনের মনোদৈহিক প্রভাব ও এর রোগ নিরাময় ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা নতুন কিছু নয়। ৬০-এর দশকে মেডিটেশনের মনোদৈহিক প্রভাব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্যে বিশেষত আমেরিকায় গবেষণার ধুম পড়ে যায়। এ ব্যাপারে ডা. হার্বার্ট বেনসন, ডা. এডমন্ড জ্যাকবসন, ডা. কিথ ওয়ালেস, ডা. কার্ল সিমন্টন প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের মেডিসিনের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন দীর্ঘ পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মেডিটেশনকালে গড়ে হার্টবিট প্রতি মিনিটে ৩টি বিট কমে। ফলে হার্টের কাজের পরিমাণও কমে যায়। উচ্চ রক্তচাপ কমে আসে। শরীরের অক্সিজেন গ্রহণ কমে আসে। দম ধীরলয়ে চলতে থাকে। রক্তে ল্যাকটেটের পরিমাণ অনেক কমে যায়, ফলে দুশ্চিন্তা হ্রাস পায়।

লন্ডনের বিরবেক কলেজের প্রফেসর ডব্লিউ. এস. বাল্লাফ এবং তার সহযোগী গবেষকরা দেখেছেন যে, রক্তে এড্রিনালিনের আধিক্য শরীরে জীবকোষ ও টিস্যুর পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেয়। আর টেনশন সবসময় রক্তে এড্রিনালিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু মেডিটেশনকালে রক্তে এড্রিনালিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই মেডিটেশন বা রিলাক্সেশনকালে ত্বক বা শরীরের যে-কোনো ক্ষতের নিরাময় দ্রুততর হয়।

সানফ্রান্সিসকোর কার্ডিওলজিস্ট ডা. ডিন অরনিশ ১৯৮৮ সালে দীর্ঘ গবেষণার পর প্রমাণ করেন যে, ৪০ জন গুরুতর হৃদরোগী তাদের করোনারি আর্টারিতে জমে থাকা চর্বি হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। অতিরিক্ত চর্বি তাদের আর্টারিগুলোর রক্ত পরিচালন পথকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে আনছিল। রোগীদের আর্টারিগুলো একটু একটু করে খুলে যাওয়ার সাথে সাথে হাটে তাজা অক্সিজেন পৌঁছাতে শুরু করে এবং তারা ভীতিকর বুক ব্যথা থেকে মুক্তি পায় এবং স্ট্রোক করার আশঙ্কা কমে আসে।

ডা. অরনিশ চিরায়ত ওষুধ বা শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির পরিবর্তে এই ৪০ জন রোগীকে সাধারণ যোগব্যায়াম, মেডিটেশন ও নিম্ন কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার গ্রহণের পরামর্শ দেন।

ডা. অরনিশের এই সাফল্য খবরের কাগজের শিরোনাম হওয়ার কারণ ছিল রক্ষণশীল ডাক্তাররা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছেন যে, আর্টারি একবার ব্লক হওয়া শুরু করলে, তার গতি আর ওল্টানো যায় না। আপনি যাই বিশ্বাস করুন না কেন আর্টারি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হাটের পেশী ধ্বংস না করা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু ডা. অরনিশের সাফল্য রক্ষণশীল ডাক্তারদের এই ধারণার মূলে আঘাত হানে এবং হৃদরোগ নিরাময়ে যোগ ব্যায়াম ও মেডিটেশনের সাফল্যকে পরীক্ষিতভাবে তুলে ধরে।

উচ্চরক্তচাপ বা হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের সাফল্য প্রশ্নাতীত। হাইপারটেনশন বা উচ্চরক্তচাপের সংকট সীমায় যাদের অবস্থান তারা মেডিটেশনে দ্রুত প্রশান্তি অনুভব করেন।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল কর্তৃক পরিচালিত ১৯৭৪ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়- ২২ জন উচ্চরক্তচাপ আক্রান্ত রোগীকে মেডিটেশন শেখার আগে ও পরে মোট ১২০০ বার পরীক্ষা করা হয়।

একমাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাদের গড় রক্তচাপ ১৫০/৯৪ থেকে ১৪১/৮৮-তে নেমে এসেছে। ডায়াস্টলিক প্রেশার সংকট সীমা থেকে নেমে যায় গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে।

সিস্টলিক প্রেশার স্বাভাবিক সীমায় না নামলেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যবয়সী একজন মানুষের স্বাভাবিক প্রেশার ধরা হয় ১২০-১৪০/৬০-৯০। সেখানে হাইপারটেনশনের সংকট সীমা ধরা হয় ১৫০/১০০।

শুধুমাত্র মেডিটেশনের চর্চা করেই অধিকাংশ রক্তচাপ আক্রান্ত রোগী অনায়াসেই নিজের প্রেশার সংকট সীমার নিচে অর্থাৎ ১৩০/৯০-এ নামিয়ে আনতে পারেন এবং এতে করে তার স্ট্রোক করার সম্ভাবনা বহুগুণ হ্রাস পায়।

মেডিটেশন অস্বাভাবিক বেশি কোলেস্টেরল মাত্রাকে কমিয়ে আনতে পারে। কোলেস্টেরল হাট অ্যাটাকের প্রাথমিক কারণ। রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল আর্টারি ব্লক হওয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আপাতত মনে হতে পারে যে, মন কীভাবে রক্তে কোলেস্টেরলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবে। কারণ রক্তের কোলেস্টেরল- খাবার, বয়স, হেরিডিটি, হজমক্ষমতা এবং লিভারের কার্যক্রমের এক জটিল প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯৭৯ সালে দুজন গবেষক এমজে. কুপার এবং এমএম আইজেন ২৩ জন উচ্চ কোলেস্টেরল রোগীকে নির্বাচিত করেন।

এদের মধ্যে ১২ জনকে মেডিটেশন করতে শেখানো হয় এবং ১১ মাস তারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন। আর অবশিষ্ট ১ জন মেডিটেশন করেন নি। এগারো মাস পর দেখা যায় যে, মেডিটেশনকারী গ্রুপের কোলেস্টেরল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। গড়ে ২৫৫ থেকে ২২৫-এ নেমে এসেছে। আমেরিকায় ২২০ মাত্রাকে স্বাভাবিক গড়মাত্রা ধরা হয়।

১৯৮৭ সালে গবেষক ডা. ডেভিড ওরম জনসন এক ব্যাপক নিরীক্ষা চালান। তার পরিসংখ্যানে দেখা যায়; যারা মেডিটেশন করেন, তাদের ডাঙারের পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

বয়স অনুপাতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যাওয়ার পরিমাণ হচ্ছে শিশু কিশোর (০-১৯ বছর পর্যন্ত) ৪৬.৮ ভাগ কম। যুবক (১৯-৩৯ বছর বয়স) ৫৪.৭ ভাগ কম। বয়স্ক (৪০ এর ওপরে) ৭৩.৭ ভাগ কম।

এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, মেডিটেশনে মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের কী পরিমাণ উন্নতি হয়। একজন মধ্যবয়সী মেডিটেশনকারী যে-সময়ে একবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন, ঠিক একই সময়ে যিনি মেডিটেশন করেন না, তিনি শরণাপন্ন হবেন ৪ বার।

বয়স্করা মেডিটেশন থেকে বেশি উপকার লাভ করে থাকেন, এই তথ্যটিই হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ রোগ যেমন আমেরিকায় জীবন সংহারক মারাত্মক দুটি ব্যাধি হচ্ছে হৃদরোগ এবং ক্যান্সার। এই সমীক্ষায় দেখা যায়- যারা মেডিটেশন করেন তাদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক অনেক কম। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিমাণ হচ্ছে ৮৭.৩ শতাংশ কম।

অর্থাৎ যারা মেডিটেশন করেন না, তাদের মধ্যে ১০০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হলে, যারা মেডিটেশন করেন, তাদের মধ্য থেকে রোগাক্রান্ত হয়ে ভর্তির পরিমাণ মাত্র ১২.৭ শতাংশ। ক্যান্সার বা টিউমারের ক্ষেত্রেও এই পরিমাণ ৫৫.৪ শতাংশ কম।

ডাক্তারি ওষুধ বা প্রচলিত রোগপ্রতিরোধ পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত কেউ এই সাফল্য দেখেনি। কোনো কোলেস্টেরল হ্রাসকারী ওষুধ যদি হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা ৫০ শতাংশ হ্রাস করতে সক্ষম হতো তাহলে তা সারা বিশ্বব্যাপী সংবাদ শিরোনামে পরিণত হতো।

ক্যান্সারের বেলায়ও এই কথাটি সত্য। এক্ষেত্রে রোগ আক্রমণ হ্রাসে যে-কোনো সাফল্য গণ্য হতো যুগান্তকারী হিসেবে।

৫০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে গবেষণা চালানোর পরও সেখানে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর হার অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে। এবং ক্যান্সার ধরা পড়ার পর রোগীর গড় আয়ুষ্কালেরও কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নি।

কিন্তু খোদ যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত পরিসংখ্যান থেকেই আমরা দেখতে পাই- মেডিটেশনের মাধ্যমে মেডিটেশনকারীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ৮৭.৩ শতাংশ হ্রাস এবং ক্যান্সারে আক্রমণের হার ৫৫.৪ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ডা. কার্ল সিমন্টন এবং ডা. বার্নি সিগেল প্রচলিত চিকিৎসার সাথে মেডিটেশনের টেকনিক প্রয়োগ করে শত শত ক্যান্সার রোগীকে নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন। মেডিটেশনের মাধ্যমে তারাও পেয়েছেন সিঙ্গাপুরের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বি জে লীর মতো নতুন জীবন।

অধ্যায়-১০

শিথিলায়ন : মনের বাড়ি

টেনশনে আক্রান্ত নন এমন কাউকে বর্তমানে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, প্রশাসক, ছাত্র-ছাত্রী, নেতা-নেত্রী বা গৃহকর্ত্রী সবাই ভুগছেন টেনশনে। টেনশনের মাত্রা কারো কম কারো বেশি।

ভোগবাদী সভ্যতার সাথে টেনশন শব্দটি জড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে। ডা. এডমন্ড জ্যাকবসন দীর্ঘ ৩০ বছর গবেষণার পর বলেছেন- সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়েও টেনশনের প্রকোপ ও বিস্তার বেশি। সর্দি-কাশি সাধারণত আটদিনে ভালো হয় এবং মানুষ সাবালক হওয়ার পর তাকে বছরে দুবারের বেশি আক্রমণ করে না।

কিন্তু টেনশন একবার ধরলে তা প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গীর ভূমিকা গ্রহণ করে। টেনশনজনিত জটিলতা যে কত ব্যাপক তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিক্রীত ওষুধের ধরন দেখে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, সবচেয়ে বেশি বিক্রীত ওষুধ হচ্ছে ট্রান্কুলাইজার।

আমাদের বহু রোগ ও শারীরিক অসুবিধার মূল কারণ হিসেবে ডা. জ্যাকবসন টেনশনকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। শুধু জ্যাকবসন কেন, বর্তমানে অধিকাংশ ডাক্তার এ ব্যাপারে একমত যে, অবসাদ ও অনিদ্রার মূল কারণ টেনশন।

টেনশনের কারণে হাত-পায়ের তালু ও শরীর অতিরিক্ত ঘামে। টেনশনের কারণে ঘাড় ও মাথাব্যথা তো খুব সাধারণ ঘটনা। টেনশনের কারণে বুকে অস্বস্তি অনুভব, নার্ভাসনেস, অহেতুক ভীতি, দুশ্চিন্তা ও বিষাদক্লিষ্টতায় আক্রান্তের সংখ্যা অনেক।

পেটের পীড়া, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক আলসার ও ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ টেনশন। উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও ডায়বেটিসের একটি বিশেষ কারণ টেনশন। ডাক্তাররা যাকে সাইকোসোম্যাটিক রোগ বলেন তার প্রধান কারণই হচ্ছে টেনশন।

সার্বিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আধুনিক সভ্যতার সাথে জড়িত ব্যাধির মধ্যে টেনশনই সবচেয়ে ধ্বংসকারী ক্ষমতার অধিকারী, যা প্রতিনিয়ত একজন মানুষকে অলক্ষ্যে নিঃশেষ করে চলে। অথচ এর কোনো কার্যকরী প্রতিষেধক ওষুধ এখনো বের হয় নি।

ওষুধ বের না হলেও এর প্রতিকারের বিকল্প পথ অবশ্য আছে। ডাক্তার জ্যাকবসন বলেছেন, টেনশন কী বুঝতে পারলে এর প্রতিকারের পথও বেরিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, টেনশন হচ্ছে আমাদের শরীরের পেশীতন্ত্রের সংকোচন।

মনে রাখতে হবে, আমাদের সকল কাজ হাড়ের সাথে সংযুক্ত ১০৩০টি পেশীর সংকোচন ও শিথিলায়ন পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে।

কিন্তু টেনশনে আক্রান্ত হলে সংকোচনের তুলনায় শিথিলায়ন কম হয়। ফলে স্নায়ুপেশীর সংকোচন বা টেনশন থেকে যায়। জ্যাকবসন বলেন যে, টেনশন বা স্নায়বিক উত্তেজনার সরাসরি বিপরীত অবস্থা হচ্ছে শিথিলায়ন।

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায়, শরীর-মনের শিথিল অবস্থায় টেনশন বা উৎকণ্ঠা থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স)- এর একটি বাণী অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'তুমি উত্তেজিত হলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, আর বসা থাকলে শুয়ে পড়।',

আশ্চর্য হলেও সত্যি যে, টেনশনের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে 'শুয়ে পড়া, বা শিথিলায়ন। আর এই শিথিলায়নের সহজ সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রয়েছে কোয়ান্টাম মেথডে।

প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সুখানুভূতির জন্যে শিথিলায়নের কোনো বিকল্প নেই। ডা. হার্বার্ট বেনসন ও ডা. এডমন্ড জ্যাকবসন দীর্ঘ গবেষণায় দেখেছেন যে- শিথিলায়নে হার্টবিট ও উচ্চ রক্তচাপ কমে, দেহে ব্যথা বা আঘাতের অনুভূতি হ্রাস পায়, শ্বাস ধীরগতি লাভ করে ও দেহে অক্সিজেনের গ্রহণ হ্রাস পায়, রক্তে এড্রেনালিন ও ল্যাকটেটের পরিমাণ হ্রাস পায়, দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং শরীর আপনা থেকেই রোগমুক্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

টেনশন, দুশ্চিন্তা ও ক্রোধে যে শক্তির অপচয় হতো, শিথিলায়নকালে ব্রেন সে শক্তিকে নিয়োজিত করে দেহের স্বাস্থ্য উদ্ধারে, মেধার বিকাশে, চেতনার বিস্তারে, সংকট নিরসনে এবং অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনে।

শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের আনন্দকে তাই বলা হয়ে থাকে নিজের বাড়িতে ফেরার আনন্দ। কারণ শিথিলায়নের পথ ধরেই মন তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আর মন তার নিজের বাড়িতে যখন সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করে তখনই আসে প্রশান্তি।

তাই কল্পনায় আপনাকে প্রথমেই মনের জন্যে একটি নিরাপদ, মনোরম ও প্রশান্তিময় বাড়ি বানাতে হবে। যেখানে আপনি দিনেরাতে যখন খুশি চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চলে যেতে পারবেন এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন।

মনের বাড়ি আপনার পছন্দমতো যে-কোনো শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপিত হতে পারে। যেমন, নদী বা লেকের পারে, দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি বা পার্কের মাঝে, কোনো পাহাড়ের চূড়ায়, হ্রদের মাঝে, কোনো বার্না, জলপ্রপাত বা সমুদ্র সৈকত বা কোনো গভীর বনে বা সমুদ্রের তলদেশে।

যেখানেই আপনি মনের বাড়ি বানান না কেন, পরিবেশ এমন হতে হবে যা আপনাকে সবসময় প্রশান্তি দেবে। এই বাড়িকে যেমন অনেকগুলো কক্ষবিশিষ্ট হতে হবে তেমনি তাকে হতে হবে ফুল-ফল-লতা-গুল্মের বাগানে পরিবেষ্টিত। সৌন্দর্য ও আনন্দ যেন ঘিরে থাকে আপনার মনের বাড়িকে।

প্রশান্তি লাভের জন্যে মনের বাড়িতে যাওয়ার পথ হচ্ছে শিথিলায়ন। একটু প্রস্তুতি ও সহজ অনুশীলনের মাধ্যমেই আপনি তা আয়ত্ত করতে পারবেন। আপনার অনুশীলনের সুবিধার জন্যে আমরা ধাপে ধাপে শিথিলায়নের পর্যায়গুলো আলোচনা করছি-

১. শিথিলায়ন অনুশীলনের জন্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে একটি নিরিবিলি ঘর বেছে নেন। নিশ্চিত হোন এ সময় কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে নিন। টেলিফোন অন্য ঘরে রেখে আসুন। অথবা টেলিফোনের আওয়াজ কমিয়ে কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখুন যাতে টেলিফোন বাজলেও তার আওয়াজ আপনাকে হতচকিত করে না দেয়। দরজা বন্ধ করলেও ঘরের ভেতরে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আর ঘর একেবারে অন্ধকার করে ফেলবেন না, হালকা আলো থাকতে হবে। গায়ের পোশাক একটু ঢিলে করে নিন। অনুশীলন শুরুর আগে দুই একদিনের মধ্যে **ঘটেছিল** এমন কোনো আনন্দদায়ক ঘটনা বা কোনো সুখানুভূতির কথা চিন্তা করুন। সে ঘটনা যত তুচ্ছই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না। অনুভূতিটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

২. শক্ত বিছানায় অথবা মেঝেতে মাদুর বা পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শুতে অসুবিধা হলে মাথার নিচে পাতলা একটি বালিশ দিতে পারেন। তবে বিছানা যত শক্ত হয় ততই ভালো। শোয়ার পর হাত থাকবে দেহের দুপাশে, হাতের তালু থাকবে উপরের দিকে। দুপায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙ্গুল ফাঁক থাকবে।

বসেও আপনি এ অনুশীলন করতে পারেন। মাদুর পেতে বা কার্পেটের ওপর সুখাসন বা পদ্মাসনে বসতে পারেন। অথবা চেয়ারেও আরাম করে সোজা হয়ে বসতে পারেন।

পদ্মাসনে বসলে হাতের আঙ্গুল থাকবে হাঁটুর ওপর। আর সুখাসনে বসলে ডান হাত থাকবে বাম হাতের ওপর ঠিক নাভির নিচ বরাবর।

চেয়ারে বসলে জুতো-মোজা খুলে প্যান্টের বেল্ট একটু ঢিলে করে নিন। চেয়ারে এমনভাবে বসবেন যাতে পায়ের পাতা ও আঙ্গুল মাটি স্পর্শ করে এবং হাতের তালু থাকে হাঁটুর ওপর। মেরুদণ্ড ও ঘাড় থাকবে সোজা।

৩. হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন। ঋ ও চেহারা কুঁচকান না। চোখের দুই পাতাকে ধীরে ধীরে একসাথে লেগে যেতে দিন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই আপনি কোনোকিছু দেখা থেকে বিরত থাকছেন এবং সবচেয়ে সক্রিয় ইন্দ্রিয় চোখকে বিশ্রাম দেয়ায় কোনোকিছু দেখে উত্তেজিত বা চিন্তাগ্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন।

৪. এবার লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়, দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের উপরের অংশ ওঠানামা করবে। এক, দুই, তিন এভাবে গুণে গুণে ৬ থেকে ১০ বার দম নিন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে সামান্য বেশি সময় নেন। দম নিতে নিতে ভাবুন, 'প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে', আর দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন, 'শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে', এভাবে ৬ থেকে ১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন।

৫. আপনার চোখ বন্ধই আছে। এক মুহূর্তে মনের চোখে নজর বুলিয়ে যান মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। এবার প্রথম ১০ সেকেন্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন মাথার তালুর পেশীগুলোতে। আপনি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অনুভব করবেন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। সেখানে একটু গরম গরম লাগছে বা একটু শিরশির করছে। এরপর অনুভব করবেন তালুর পেশী শিথিল হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে আপনি পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, ঠোঁট ও জিহবা, চোয়াল, মুখমণ্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, উরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। বর্ণিত প্রতিটি অঙ্গ অবলোকন করুন। অবলোকনের সাথে সাথে অনুভব

করবেন প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। পেশী শিথিল হয়ে ভারী হয়ে আসছে (অনুশীলন শুরু করার আগে কোন অঙ্গের পর কোন অঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবেন তা কয়েকবার পড়ে মুখস্ত করে ফেলুন। তাহলে অনুশীলনের সময় কোনো অসুবিধা হবে না)।

আপনি যখন মাথা থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পায়ে পাতা পর্যন্ত নামতে থাকবেন, তখন অনুভব করার চেষ্টা করুন যে বরফ গলা পানি যেমন বরফের গা বেয়ে নিচের দিকে নামে, তেমনি শিথিলতা যেন শ্রোতের মতো আপনার গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

৬. ভাবুন আপনার অঙ্গ শিথিল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। এবার আবার ৫ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার জন্যে সময় একটু বেশি নিন। এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে হতে দিন। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন দমের ওপর। বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে ঢুকছে তা অনুভব ও মনের চোখে অবলোকন করুন। অনুভব ও অবলোকন করুন বাতাস কীভাবে ফুসফুসের প্রতিটি কোষে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসছে। দমের আসা-যাওয়ার ওপর আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলেও আপনি দমকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন না। বাতাস স্বাভাবিক আসা-যাওয়া করবে, আপনি শুধু দমের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

৭. আপনি এবার সচেতন হোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে। কীভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আপনার শরীরকে নিচের দিকে টানছে তা অনুভব করুন। নিজের ওজন অনুভব করুন। অনুভব করুন মাথার ওজন। কাঁধ, বুক, নিতম্ব, হাত, পায়ে ওজন বেড়ে গেছে তা খেয়াল করুন। অনুভব করুন তা ভারী হতে হতে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই, পরিণত হয়েছে বালুকণায়।

৮. অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো খসে পড়তে শুরু করেছে। আঙ্গুল, হাত, পা, বুক, পেট, উরু সব বালুর মতো খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তূপে। যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন যে আপনার পুরো শরীর সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

৯। আপনি এখন সূক্ষ্ম বালুকণার স্তূপ। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস বাড়ার রূপ নিচ্ছে আর বাড় আপনার

শরীরের অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালুকণাগুলো রয়েছে তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন।

আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে গেছেন আপনি। আপনার ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বিটা স্তর থেকে নেমে গেছে আলফায়।

মনের বাড়ির পথে এখন আপনি আলফা প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছেছেন। এই প্ল্যাটফর্মে আপনার জন্যে রয়েছে বিশেষ ওয়েটিং রুম।

এবার মনে মনে বলুন, আলফা প্ল্যাটফর্ম থেকে এখন আমি আরো গভীরে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ মনের বাড়িতে থাকবো, ততক্ষণ বাইরের কোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দ আমার মনোযোগ বা একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। বরং সে শব্দে আমার মনোযোগ গভীর হবে। তবে আগুন, ভূমিকম্প বা কোনো বিপজ্জনক বা জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমি যত গভীর লেভেলেই থাকি না কেন, মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠব এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

১০. আলফা প্ল্যাটফর্ম থেকে মনের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে এবার বিশেষ কাউন্ট ডাউন শুরু করুন। ১৯ থেকে ০ পর্যন্ত গণনার পর আপনি আলোর পথ দিয়ে পৌঁছে যাবেন মনের বাড়িতে। ১৯ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি অবলোকন (ভিজুয়ালাইজ) করুন শীতল নীল স্নিগ্ধ আলো বর্ষিত হচ্ছে আপনার ওপর। আলোয় আপনি স্নাত হচ্ছেন। আলোর এক দীর্ঘ পথ রচিত হয়েছে আপনার জন্যে। আর সে পথ পৌঁছে গেছে মনের গভীর স্তরে মনের বাড়িতে। আপনি ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ উচ্চারণ করুন। এবার মনে মনে বলুন, 'আলোর পথ দিয়ে আমি পৌঁছে যাচ্ছি মনের গভীর থেকে গভীরে।

আবার ১০, ৯, ৮, ৭, ৬। মনে মনে বলুন, 'গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি আমি।', ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ উচ্চারণ করুন। মনে মনে বলুন, 'আমি পৌঁছে গেছি মনের বাড়িতে।', আর অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি। উপলব্ধি করুন নিজের সচেতনতার ব্যাপ্তি।

১১. মনের বাড়িতে পৌঁছার পর আপনি প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করুন। ফুলের সুবাস, পাতার রং, পাখির কলতান, বর্নার শব্দ বা সমুদ্রের তরঙ্গ, আকাশে মেঘের ভেলা, যা যা দেখতে পাবেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন। তারপর মনের বাড়ির ড্রইংরুমে আরাম করে বসুন।

১২. মনের বাড়ি চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এ স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে মন দেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময়ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এ স্তরে মন যে কোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেনকে পুরোপুরি কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। মনের বাড়িতে আপনার যে কোনো 'অটোসাজেশন, মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে।

এবার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করুন। মনে মনে বা জোরে জোরে বলুন, 'ভবিষ্যতে শিখিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে তিনবার আরাম আরাম আরাম উচ্চারণ করব তখনই আমার দেহ-মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি পরিপূর্ণ শিখিল হয়ে যাব। যখনই এরপর ১৯ থেকে ০ পর্যন্ত গণনা করব তখনই মনের বাড়িতে পৌঁছে যাব।

এরপর মনকে আরো কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারেন। যেমন মনে মনে বলতে পারেন, 'এখন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আমার টেনশন কমবে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়বে। আমার মনোযোগ বাড়বে। আমার শরীর ও মন সবসময় সুস্থ থাকবে। অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। ইতিবাচক চিন্তা আমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। আমি যা চাই ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে তা পাব। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি।

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মনোদৈহিক বা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরই এখন শক্তিতে পরিণত হবে।

১৩. এবার জেগে ওঠার পালা। আপনাকে এখন মনে বাড়ি থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে হবে। প্রথমে লম্বা দম নিন। মনে মনে বা আওয়াজ করে বলুন, '০ থেকে ৭ পর্যন্ত গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠব। এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। অনুভব করুন উড়ে যাওয়া বালুকণাগুলো চারপাশ থেকে এসে আপনার শরীর গঠন করেছে। ২, ৩। লম্বা দম নেন। অনুভব করুন বালুকণাগুলো প্রাণবন্ত জৈবকোষে পরিণত হয়েছে। ৪, ৫। আবার লম্বা দম নেন। মনে মনে বা জোরে জোরে বলুন, '৭ পর্যন্ত গুণে আমি চোখ মেলে তাকাব, আমি পুরোপুরি জেগে উঠব, আমার মাথা, ঘাড়, কাঁধ বা শরীরে কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি থাকবে না। পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ, সবল ও চাঙ্গা অনুভব করবো। ৬, ৭। এবার

চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টান টান করুন। হাত নাড়াচাড়া করুন। আস্তে আস্তে উঠে বসুন বা দাঁড়ান। জোরে বলুন, 'বেশ ভালো লাগছে। শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।, এই অনুশীলনী প্রথমবার করার পর আপনার মধ্যে কিছুক্ষণ একটি আড়ষ্টভাব থাকতে পারে। তাই দ্রুত হাত-পা নাড়াচাড়া করতে যাবেন না। তাহলে পেশীতে টানপড়া বা খিঁচুনি লাগতে পারে। অবশ্য আপনার বেশ আরাম লাগবে। তরতাজা একটা অনুভূতি পাবেন। দেখবেন শরীর মন অনেক প্রশান্ত হয়ে গেছে।

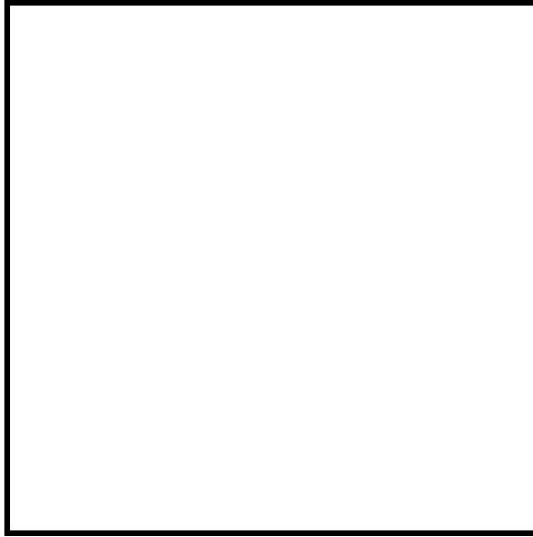
আপনি এই প্রক্রিয়ায় শিখিলায়নের যত চর্চা করবেন ততই টেনশন, অবসাদ কমতে থাকবে আপনার। ক্রমেই এক প্রশান্তি অর্জন করবেন। বাড়তে থাকবে আপনার আত্মবিশ্বাস, প্রাণচাঞ্চল্য ও কর্মোদ্দীপনা।

অধ্যায়-১১

গাছ কথা বলে!

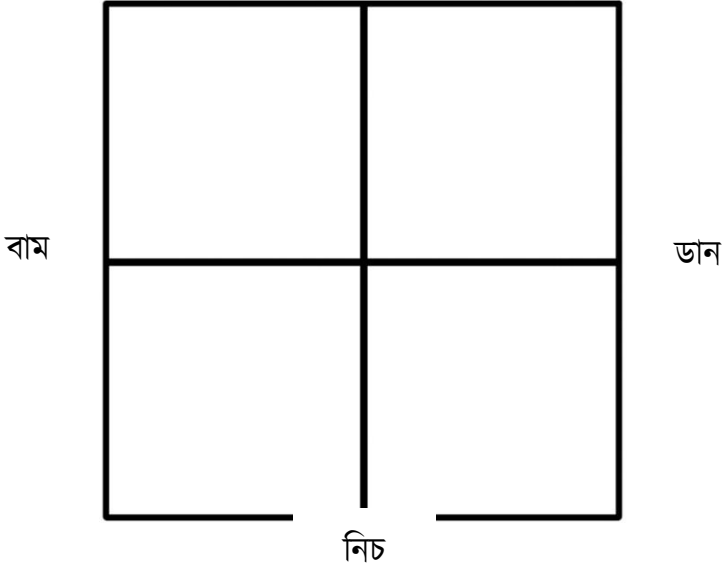
গাছ অনেক কথা বলতে পারে। তবে নিজের সম্পর্কে নয়, আপনার সম্পর্কে। আপনি মানুষ হিসেবে কেমন? আপনার চিন্তাশক্তি কতখানি? বাস্তবতাবোধ কতটুকু? কল্পনা দ্বারা আপনি কতটুকু প্রভাবিত? মাটি ও ঐতিহ্যের প্রতি আপনার টান কতটুকু? আবেগপ্রবণতা আপনার মধ্যে কতটুকু কাজ করে? কতখানি উচ্চাভিলাষী আপনি? স্নেহ-মমতাই বা কতটুকু আছে আপনার মধ্যে? এর অনেক কিছু গাছ আপনাকে বলে দিতে পারে।

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে হাতে একটি পেন্সিল নিন। নিচের ফাঁকা চৌকো স্থানে একটি গাছের স্কেচ আঁকুন। গাছ সম্পর্কে মনে যা আসে তাই আঁকুন। ছবি আঁকতে জানেন কি জানেন না তা কোনো বিষয় নয়। আপনি যা আঁকলেন তাই আপনাকে বিশ্লেষণের জন্যে যথেষ্ট। কারণ আপনি নিজের অজান্তেই আপনার চরিত্র বৈশিষ্ট্য এঁকে ফেলেছেন।



মনোবিজ্ঞানীরা একটি গাছের ছবিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। উপর-নিচ, ডান-বাম।

উপর



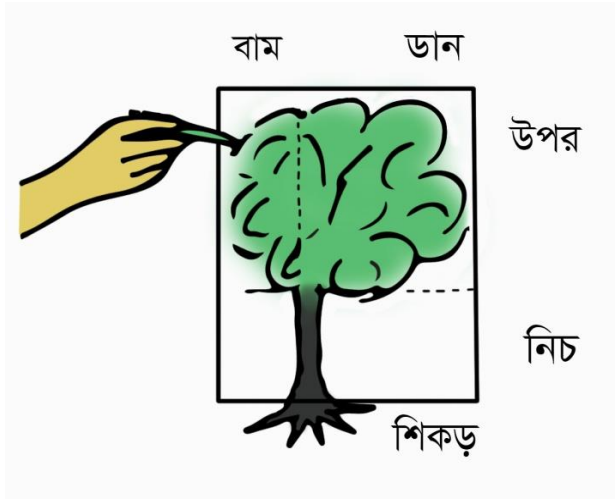
উপর : নির্দেশ করে কল্পনা, সৃজনশীলতা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা।

নিচ : নির্দেশ করে বাস্তবতা, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, মাটির সাথে সম্পর্ক।

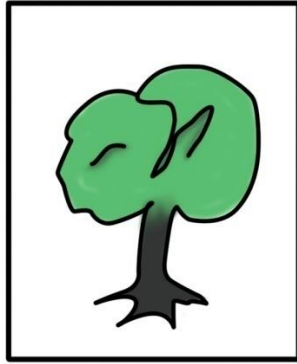
বাম : নির্দেশ করে অতীত

ডান : নির্দেশ করে ভবিষ্যৎ।

এবার আপনি দেখুন, আপনি যে গাছ এঁকেছেন, কোনটার সাথে তার কতটুকু মিল আছে।

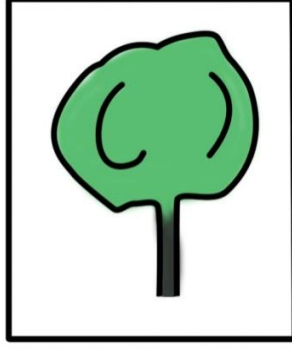


১.



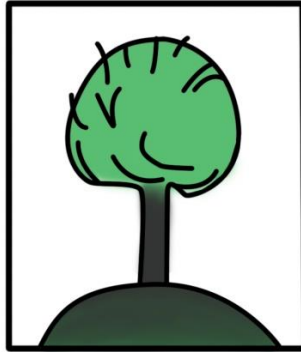
গাছের শিকড় দেখা গেলে আপনার জীবনে মাটির সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ঐতিহ্য ও চিরায়ত ধারণাই আপনার প্রধান চালিকাশক্তি। অহেতুক চিন্তা থেকে আপনি বহুলাংশে মুক্ত। নিজের শিকড় সম্পর্কে আপনার সচেতনতা আপনার আস্থার মূল ভিত্তি।

২.



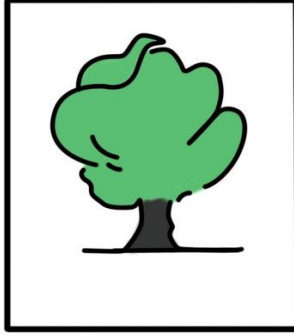
গাছের শিকড় দেখা না গেলে বা জমিনের রেখা দেখা না গেলে আপনি অনেকটা শিকড়হীন। অনেকটা ঐতিহ্য ও মূলনীতি বিবর্জিত। আপনি মূলত সুযোগসন্ধানী। সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত।

৩.



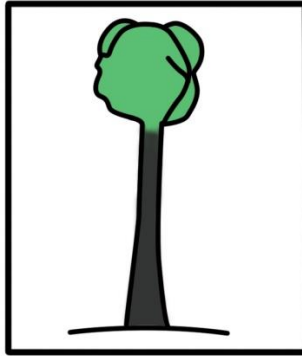
গাছ পাহাড়ি জমিতে থাকলে আপনি বহুলাংশে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী। নিজে একা থাকতে চান। অনেকটা আত্ম-কেন্দ্রিক বলা যায়। অন্যকে সহায়তা করার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কম। তবে আপনি সবসময় অন্যের সহায়তা বা আশ্রয় চান।

৪.



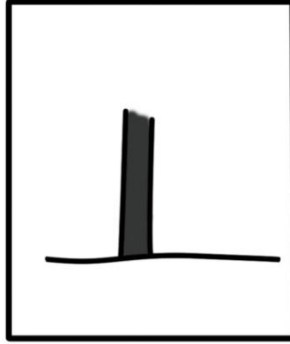
গাছের কাণ্ড ছোট ও শাখা-প্রশাখা অনেক বড় ও প্রশস্ত এবং পাতায় ভরপুর হলে আপনি আত্ম-সচেতন, উচ্চাভিলাষী ও খ্যাতিপ্রিয়। আপনার আবেগজনিত সমস্যা আপনি নিজেই সমাধান করতে সক্ষম। আপনার কল্পনাপ্রিয় মন সবসময় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। নিজের সম্পর্কে আপনার অতিরঞ্জিত ধারণা থাকতে পারে, থাকতে পারে একটা হামবড়া ভাব। তবে মেধাবী হওয়ার কারণে যে-কোনো পরিস্থিতির সাথে সহজে খাপ-খাইয়ে নিতে পারেন।

৫.



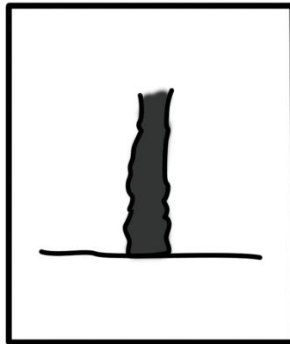
কাণ্ড বেশ লম্বা আর উপরের অংশ ডালপালা, পাতা ছোট হলে বুঝতে হবে আপনার বেড়ে ওঠার সময় স্নেহ-মমতা কম পেয়েছেন। শিশুকালে হয়তো অবহেলার শিকার হয়েছেন। (শিশুরাই এই ধরনের গাছের ছবি বেশি আঁকে)।

৬.



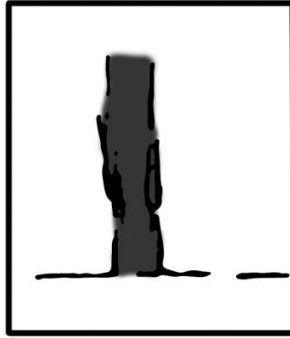
কাণ্ড সমান্তরাল সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত হলে এবং তা মাটির উপর থাকলে আপনি নীতিবান, কর্মঠ, বাস্তববাদী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৭.



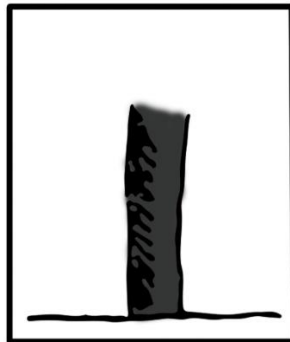
কাণ্ড সোজা কিন্তু অসমান্তরাল আঁকাবাঁকা রেখা দিয়ে গঠিত হলে অবস্থা যাই হোক না কেন আপনি খুব দ্রুত পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে পারেন। যে-কোনো অবস্থায় প্রফুল্লচিত্তে জীবনযাপন করতে সক্ষম।

৮.



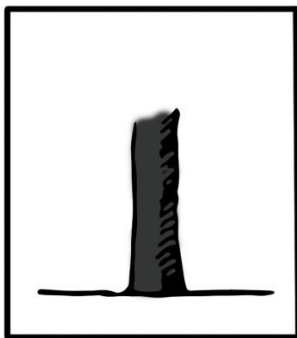
কাণ্ডের রেখা ভাঙাচোরা হলে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আবেগপ্রবণ। চিন্তাভাবনা না করে কাজ করার প্রবণতা রয়েছে আপনার মধ্যে। সহজেই রেগে যান। বদ-মেজাজ ও হঠকারিতামূলক মনোভাব থাকতে পারে আপনার মধ্যে।

৯.



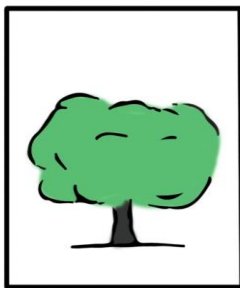
কাণ্ডের বামদিকে শেড বা ছায়া দেখা গেলে আপনি লাজুক প্রকৃতির। কিছুটা ভীরা। সঙ্কোচ আপনার অনেক সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে। নিজের ভুবনে, নিজের অতীতে ডুবে থাকার প্রবণতা আপনার রয়েছে প্রবল।

১০.



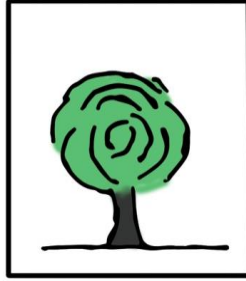
কাণ্ডের ডানদিকে শেড বা ছায়া দেখা গেলে আপনি বহিমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অপরিচিতদের সাথে দ্রুত আলাপ জমাতে সক্ষম। সাংগঠনিক ক্ষমতা আপনার রয়েছে। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে আগ্রহী।

১১.



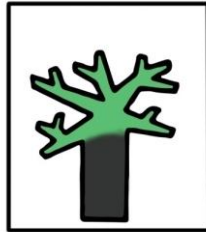
গাছের উপরের অংশ অনেক প্রশস্ত, সমতল ও চেপ্টা হলে আপনার ধীশক্তি কম। বাইরের চাপের কাছে সহজেই নতি স্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে আপনার। আপনি যেমন হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারেন তেমনি আত্মবিশ্বাস রয়েছে আপনার। সাফল্য লাভের জন্যে নিজের যোগ্যতার ওপর আপনাকে আস্থা স্থাপন করতে শিখতে হবে।

১২.



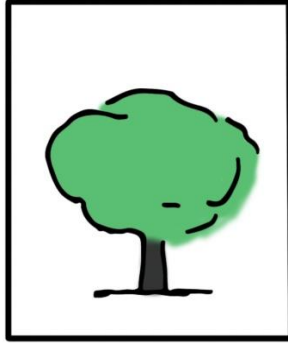
গাছের উপরের অংশ একেবারে গোলাকার হলে আপনি কল্পনাপ্রবণ ও আত্মতৃপ্ত। আপনি দয়ালু, উষ্ণ ও বন্ধুবৎসল। সাধারণভাবে বিশ্বাসী। দূরদর্শিতাও রয়েছে আপনার। তবে আপনি বহুলাংশে অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে উঠতে পারেন।

১৩.



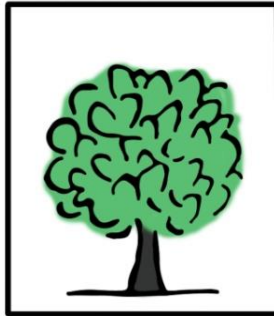
গাছের উপরের অংশে শুধু ডালপালা দৃষ্টিগোচর হলে, কোনো পাতা না থাকলে আপনি পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও এডভেঞ্চারপ্রিয়। তবে ধৈর্যের অভাব থাকতে পারে আপনার মধ্যে। অন্যের ব্যাপারে আপনি হতে পারেন অত্যন্ত সমালোচনামুখর ও অসহিষ্ণু।

১৪.



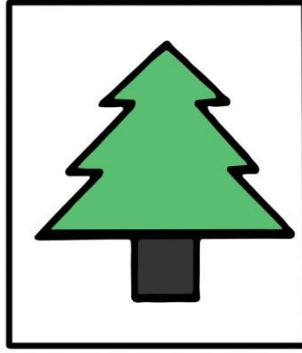
গাছের উপর অংশে মেঘের মতো মনে হলে আপনি কল্পনাবিলাসী, স্বাপ্নিক ও আবেগপ্রবণ, কর্মস্পৃহা, উদ্দীপনা ও উদ্যমের অভাব রয়েছে আপনার।

১৫.



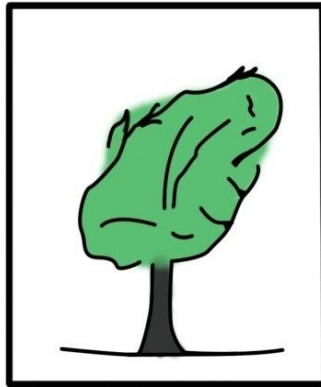
গাছের উপরের অংশ ঘন পাতায় আচ্ছন্ন হলে আপনি মিশুক, সামাজিক, বাকপটু, আবেগপ্রবণ ও হুজুগে। সহজে তর্ক ও গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

১৬.



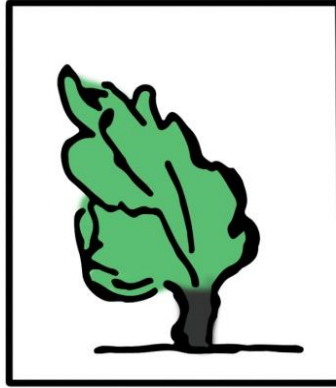
গাছের উপরিভাগ স্তরে স্তরে ডালপালা শোভিত হলে আপনি ঐতিহ্যপ্রিয়, নীতিবাদী গঠনমূলক মেধার অধিকারী। আপনি সৃজনশীল, কিন্তু তোষামোদ দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হন।

১৭.



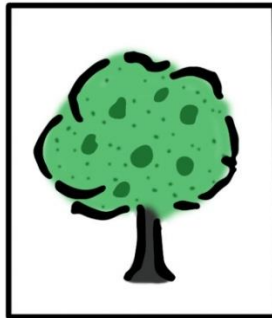
গাছের উপরের অংশ ডানদিকে হেলানো থাকলে আপনি প্রাণখোলা, সদালাপী, কর্মতৎপর, সদাব্যস্ত এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আস্থাশীল।

১৮.



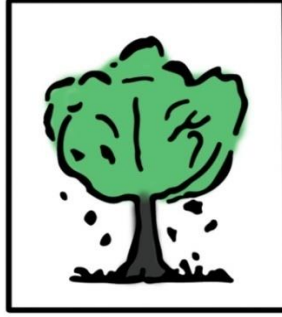
গাছের উপরের অংশ বামদিকে হেলানো থাকলে আপনি আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী, সতর্ক, নির্জনতাপ্রিয় ও কিছুটা আত্মগর্বী। তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা উদ্বেগ সবসময় আপনার মধ্যে কাজ করতে পারে।

১৯.



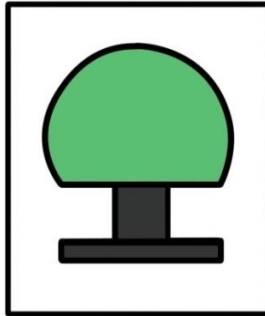
গাছে অনেক ফল ঝুলতে দেখা গেলে আপনি বাস্তববাদী ও দূরদৃষ্টির অধিকারী। আপনি যে-কোনো কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করে বস্তুগত সাফল্য লাভে আগ্রহী।

২০.



গাছ থেকে ফল ও পাতা পড়ছে দেখা গেলে আপনি অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। যে-কোনো কিছু সম্পর্কে গভীর উপলব্ধিতে পৌঁছতে সক্ষম। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আপনার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু নীতির ব্যাপারে রয়েছে এক ধরনের দ্বিধাগ্রস্ততা।

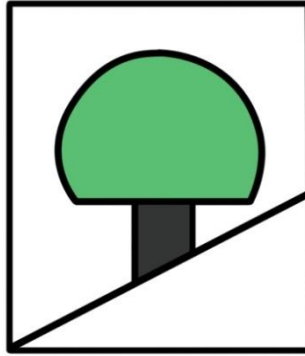
২১.



আপনার গাছ কোনো ছোট দ্বীপে স্থাপিত হলে তা নির্দেশ করে যে আপনি নিরাপত্তা খোঁজ করছেন। বিশেষত ভাবাবেগের নিরাপত্তা। আপনার মধ্যে আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও

প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষার ব্যাপারে নির্মম হতে পারেন। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবসময় আপনার কাছে অগ্রাধিকার পায়।

২২.



গাছ কোনো পাহাড়ের ঢালে স্থাপিত হলে বুঝতে হবে যে আপনি অত্যন্ত সতর্ক। অন্যদের ব্যাপারে সন্দেহপরায়ণ। আপনি মাঝে মাঝে নিজেকে নিঃসঙ্গ ও অবহেলিত মনে করেন। আপনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব রয়েছে। তাই বাইরে থেকে আপনাকে অত্যন্ত ঠান্ডা ও হিসেবী মনে হতে পারে।

অধ্যায়-১২

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়

আমরা স্বপ্ন দেখি। সবাই কমবেশি স্বপ্ন দেখি। কখনো এ স্বপ্ন হয় মধুর, কখনো ভয়ঙ্কর। দুঃস্বপ্ন দেখলে আমরা ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসি। নিজেকে প্রবোধ দিই, না ওটা শুধু স্বপ্ন-ঘাবড়াবার কিছু নেই।

স্বপ্নের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। অনেকে স্বপ্নকে নেহাত স্বপ্নই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। অনাগত কঠোর বাস্তবের প্রতিচ্ছায়াও থাকে এই স্বপ্নে।

এক

স্বপ্নে নিজেকে মৃত দেখার ঘটনা বিরল নয়। আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে এমনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি তার স্ত্রী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়ার্ড লেমনের নিকট তার স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করেন।

লিঙ্কন বলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি হোয়াইট হাউসের বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোনো কক্ষেই কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু শুনিছি প্রতিটি কক্ষ থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ।

'হোয়াইট হাউসের পূর্বদিকের কক্ষে আমি দেখতে পেলাম পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রক্ষিত একটি কফিন। প্রহরী সৈনিকদের চারদিক ঘিরে রয়েছে শোকাচ্ছন্ন নারী-নর।

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কার লাশ? হোয়াইট হাউসে কে মারা গেছেন?

'তারা জবাব দিল, প্রেসিডেন্টের। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন স্বীকার করেন যে, 'যদিও এটি ছিল একটি স্বপ্ন, তবুও তা আমার মনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সারা রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হলো, আমি সবকিছুর পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মনটা বেদনায় নীল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও আমি এই বেদনাদায়ক অনুভূতিকে দূরে ঠেলে দিতে পারছিলাম না।

লিঙ্কন যেদিন আততায়ীর হাতে নিহত হন, সেদিন বিকেলে তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠক ডাকেন। নির্ধারিত কক্ষে ঢুকে মন্ত্রীরা দেখতে পান যে, প্রেসিডেন্ট আগেই এসে আসন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার মাথা টেবিলের ওপর নোয়ানো।

দুহাতের মাঝে মাথা এমনভাবে ডুবে আছে যে, তার মুখাবয়ব দেখার উপায় নেই। মন্ত্রীদের পদশব্দে প্রেসিডেন্ট মাথা তুললেন ও ঠিক হয়ে বসলেন।

‘ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শিগগিরই কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনতে পাবেন।, সম্বোধনের জবাব দিয়ে প্রেসিডেন্ট তাদের বললেন।

‘মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আমাদের জন্যে কি কোনো অশুভ সংবাদ রয়েছে?, একজন মন্ত্রী জানতে চাইলেন।

লিঙ্কন জবাবে বললেন, ‘আমি কিছু শনি নি। আমার কাছে কোনো খবরও নেই। কিন্তু গতরাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি নৌকায় আমি সম্পূর্ণ একা। নৌকায় কোনো দাঁড় নেই, কোনো হাল নেই। অথৈ সাগরে নিঃসহায়ের মত একা ভেসে চলেছি।

কক্ষের মাঝে নিঃসীম-নিস্তর্রতা নেমে এল। এখন কী বলতে হবে, কেউই তা জানেন না। প্রেসিডেন্ট বলে চললেন- গৃহযুদ্ধকালে কয়েকবার আমি এ স্বপ্ন দেখেছি। প্রতিবারই একদিন বা দুদিনের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ! আমার মনে হচ্ছে, সম্ভবত আগামীকাল- সম্ভবত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবেন।

এর পাঁচ ঘণ্টা পরই মহান লিঙ্কন আততায়ীর হাতে নিহত হন।

দুই

স্বপ্ন-একটি মাত্র স্বপ্ন ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল ব্যাপকভাবে। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার তখনও জীবিত। তার একজন প্রভাবশালী সভাসদ সিসিরো এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, সিজারের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্যে দেবতা জুপিটার সিনেটের তনয়দের প্যারেড পরিদর্শন করছেন। কিন্তু কাউকেই দেবতার মনঃপুত হলো না।

এমন সময় প্যারেডের মাঠে দেখা গেল এক অদ্ভুত তরুণকে। দেবতা জুপিটার তাকেই মনোনীত করলেন সিজারের উত্তরাধিকারী। ঘুম ভাঙার পরও সিসিরোর মনে স্বপ্নে দেখা তরুণের মুখচ্ছবি ভাসতে লাগল।

পরদিন সিসিরো দরবারে যাওয়ার পথে একদল তরুণের সাক্ষাৎ পেলেন। তারা শরীরচর্চা শেষে ফিরছিল। তাদের মধ্যেই তিনি দেখতে পেলেন স্বপ্নে দেখা তরুণকে। সিসিরো এর পূর্বে সে তরুণকে কখনো দেখেন নি। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন, তরুণের নাম অষ্টাভিয়াস। তার বাবা-মার তেমন কোনো পরিচিতি রাজধানীতে নেই।

কয়েক বছর পরের কথা। সিজারের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলো। সিসিরো তার স্বপ্নের বলে বলীয়ান হয়ে সর্বশক্তিতে অষ্টাভিয়াসের পক্ষ সমর্থন করলেন। অষ্টাভিয়াস আরোহণ করলেন রোমের সিংহাসনে। অষ্টাভিয়াসই পরে সর্বশ্রেষ্ঠ রোম সম্রাট হিসেবে অগাস্টাস নামে ইতিহাসখ্যাত হন।

তিন

১৯০৯ সালে সারা ভারতে তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জোয়ার বইছে। লন্ডনে লেগেছে তার ঢেউ। সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করতে পারে - এ আশঙ্কা তখন লন্ডনের সবার মনে।

ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের ওপর নজর রাখার দায়িত্ব স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিশেষ গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ম্যাক লাফলেনের ওপর অর্পণ করেন।

ইন্সপেক্টর ম্যাক লাফলেন এক রাতে স্বপ্ন দেখেন লালধিংরা নামে এক ভারতীয় ছাত্র একটি বিরাট ভবনের বাইরে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরপর থেকে তিনি লালধিংরার ওপর সতর্ক নজর রাখতে লাগলেন। স্বপ্ন দেখার পর ইন্সপেক্টর ভবনটি শনাক্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লন্ডনের বহু রাজপথ পরিক্রমণ করেও তিনি সে ভবনটি শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

১৯০৯ সালের পহেলা জুলাই দক্ষিণ কেনিংস্টনের ইম্পেরিয়াল ইন্সটিটিউটে ভারতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ অফিসারদের সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ভারত বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী স্যার কার্জন উইলি এবং তার বিশিষ্ট বন্ধু পার্সি চিকিৎসক ডাক্তার কাউস লাল কাকাও এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন।

জমজমাট এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের পরেও চলতে থাকে। রাত নয়টায় স্যার কার্জন ও আরো কয়েকজন অতিথি বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্যার কার্জন ভবনের প্রধান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন।

কিন্তু তিনি নিচে নেমে আসতে না আসতেই একটি স্তম্ভের আড়ালে আত্মগোপনকারী লালধিংরা বিদ্যুৎগতিতে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মাত্র দুহাতের ব্যবধানে থেকে লালধিংরা পরপর পাঁচটি গুলি করে তাকে।

ডাক্তার লাল কাকা কার্জনের পেছনে আসছিলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু লালধিংরার রিভলভারের শেষ গুলিটি আঘাত করে তাকে। তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইস্পেক্টর লাফলেন পরদিন দিবালোকে ভবনটির সামনে এসে দাঁড়ান। এবার শনাক্ত করতে পারেন ভবনটিকে। স্বপ্নে তিনি এ ভবনটিই দেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখার পর লন্ডনের বহু রাজপথের দুধারে তিনি এ ভবনটির খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে কেনিংস্টনের এক্সিভিশন রোড ও তার আশেপাশের কয়েকটি রাস্তায় তিনি আসেন নি।

চার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ঘটনা। এ সময় একটি স্বপ্ন মিত্রপক্ষের সামরিক গোপনীয়তা রক্ষায় যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তখন চীনা বন্দর সোপাটোর ব্রিটিশ কন্সাল ছিলেন মি. রোনাল্ড হল। তার স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন : এক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি স্বপ্নে দেখি, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটায় আমি অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন। আমি তখন আর মুক্ত নই। ব্রিটিশ কন্সাল হিসেবেও আমি কর্মরত নই।

এই স্বপ্ন আমাকে বেশ প্রভাবিত করে। আমি গভীর রাতে ঘুমুতে গেলেও খুব ভোরে উঠে পড়ি। অস্বস্তি দূর করার জন্যে নিচের তলায় নেমে যাই ম্যানিলা বেতারের ভোরের খবর শোনার জন্যে।

ম্যানিলা বেতার ধরার সাথে সাথেই আমি শুনলাম, আজ সকালে ম্যানিলায় বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। কালবিলম্ব না করে আমি আমার দফতরের পথে রওয়ানা হই। দফতরে পৌঁছেই সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ ভস্মীভূত করতে শুরু করি। দলিল-দস্তাবেজ ভস্মীভূত করে নিশ্চিহ্ন করতে না করতেই জাপানিরা আমাকে বন্দি করে।

আমার আমেরিকান সহকর্মী অবশ্য এতটা ভাগ্যবান ছিলেন না। জাপানিরা তাকে বিছানা থেকেই গ্রেফতার করে। ফলে তিনি কোনোকিছু ভস্মীভূত করতে সক্ষম হননি।

স্বপ্ন দেখার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমি জাপানি জেনারেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল, যেহেতু অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাই বৃটিশ কপাল হিসেবে আমার আর কোনো মর্যাদা নেই।

পাঁচ

প্রখ্যাত মার্কিন কথাশিল্পী মার্ক টোয়েন ছিলেন অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ। পেনসিলভানিয়া স্টিমারে খালাসীর কাজ করার সময় একদিন তিনি তার বোনের বাসায় বেড়াতে যান। রাতও কাটান সেখানে। রাতে তিনি দেখেন এক অভাবিত স্বপ্ন। তিনি দেখেন একটি হল ঘর, অনেক লাশের মধ্যে রয়েছে তার ছোট ভাই হেনরির লাশ। অন্যান্য লাশ কাঠের কফিনে থাকলেও হেনরির লাশ রয়েছে ধাতব কফিনে। হেনরির বুকের ওপরে রয়েছে শ্বেত পুষ্পস্তবক। আর তার মাঝখানে শোভা পাচ্ছে একটি লাল গোলাপ।

এ স্বপ্ন তাকে এত আচ্ছন্ন করে ফেলে যে তিনি বিছানা থেকে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন। সে গভীর রাতে রাস্তায় কোনো গাড়ি না পেয়ে হেঁটেই রওনা হন ভাইয়ের লাশ দেখার উদ্দেশ্যে। অবশ্য আধা মাইল হাঁটার পর তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, তিনি শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখেছিলেন, এর সাথে বাস্তবের কোনো যোগাযোগ নেই। তাই আবার বাসায় ফিরে আসেন। সকালে নাস্তার টেবিলে তিনি স্বপ্নের কথা বলেন তার বোনের কাছে।

এর কয়েকদিন পর তিনি ও হেনরি পেনসিলভানিয়া স্টিমারে করে নিউ অরলিন্সে যান। সেখান থেকে তাকে বদলি করা হয় টি এ লেকী স্টিমারে। পেনসিলভানিয়া দুদিন আগেই নিউ অরলিন্স থেকে যাত্রা শুরু করে। কয়েকদিন পরে পেনসিলভানিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে হেনরি মারাত্মকভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার পর ছয় দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেনরি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

মার্ক টোয়েনকে তার ভাইয়ের লাশ দেখানোর জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হেনরির লাশ দুর্ঘটনায় নিহত অন্যান্যের লাশের সাথে একটি হল কক্ষে রাখা হয়েছিল।

হল কক্ষে হেনরির লাশ ছাড়া অন্যান্যের লাশ ছিলো কাঠের কফিনে। হেনরির লাশই শুধু ছিলো ধাতব কফিনে। তার তারুণ্য ও আকর্ষণীয় চেহারা মেমফিসের মহিলাদের বেশ প্রভাবিত করেছিল। তারা চাঁদা করে হেনরির জন্যে একটা ধাতব কফিন কেনে। তার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করে শ্বেত পুষ্পের একটা তোড়া। তারা তোড়াটি রাখে হেনরির ঠিক বুকের ওপর।

মার্ক টোয়েন হল ঘরের দরজায় এসেই থমকে দাঁড়ান, এবার বাস্তবতাকেই স্বপ্ন বলে ভ্রম হয় তার। স্বপ্নের দেখা ঘটনা আর বাস্তবতায় অমিল নেই কোনো- শুধু লাল গোলাপটি ছাড়া। তিনি

দরজায় দাঁড়িয়ে যখন এ কথা ভাবছেন, তখন আরেক মহিলা একটি লাল গোলাপ হাতে নিয়ে তার গা ঘেঁষে কক্ষে প্রবেশ করে। মহিলা সরাসরি হেনরির কফিনের নিকট যায়। শ্বেত পুষ্পস্তবকের ওপর আলতোভাবে রাখে লাল গোলাপটি।

হয়

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল গর্ডন তখন ভারতে। এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি খরশোতা নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নদী পার হওয়ার জন্যে একটি ধূসর রঙের নৌকায় কয়েকজন সৈন্যসহ উঠছেন। মাঝ পথে যাওয়ার পর তাদের নৌকা ডুবতে শুরু করে। এ সময় তিনি তার পাশে যে সৈনিককে দাঁড়ানো দেখতে পান তাকে তিনি ইতঃপূর্বে অবাধ্যতার জন্যে শাস্তি দিয়েছিলেন।

পর পর কয়েক রাত তিনি এ স্বপ্ন দেখেন। প্রতিবারেই নৌকা নিমজ্জিত হতে শুরু করার সময় তার পাশে সেই সৈনিককে দাঁড়ানো দেখতেন।

এর অল্প কিছুদিন পর জেনারেল গর্ডনকে একটি খরশোতা নদী অতিক্রম করতে হয়। তিনি নৌকায় উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ লক্ষ করলেন যে, নৌকাটি স্বপ্নে দেখা নৌকার ন্যায় এবং এর রংও ধূসর। আরো ভালো করে লক্ষ করতাই তিনি দেখতে পেলেন যে, তার সঙ্গী সৈনিকদের মধ্যে এমন একজন রয়েছে, যাকে তিনি ইতঃপূর্বে অবাধ্যতার জন্যে শাস্তি দিয়েছেন।

একজন জেনারেলের পক্ষে স্বপ্নের ওপর গুরুত্ব দান কিছুটা অস্বাভাবিক। কেউ কেউ একে বোকামিও মনে করতে পারেন। কিন্তু জেনারেল গর্ডন নৌকায় উঠলেন না। বরং সৈনিকদের নৌকা টেনে ডাঙ্গায় তোলার নির্দেশ দেন। নৌকা ডাঙ্গায় ওঠানোর পর তা ওল্টাতে বলেন। নৌকা ওল্টানোর পর দেখা যায় যে, নৌকার তলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র। নৌকার ওপর পাটাতনের জন্যে তা দেখা যাচ্ছিল না। নৌকা ওপরে তোলার এই অভাবিত ঘটনা দেখে সৈনিকটি জেনারেল গর্ডনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। সকল অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে।

জেনারেল গর্ডন লিখেছেন, 'যদি আমি আমার স্বপ্নের সতর্কবাণীতে কান না দিতাম, যদি সতর্ক না হতাম, তবে আমার সাথে সবাইকে নদীতে নিমজ্জিত হতে হতো। কারণ নদীর শ্রোত ছিলো অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সাত

ম্যান দ্বীপে বসবাসরত বালক এড্রিন ক্রিস্টিয়ান স্বপ্ন দেখে যে, সে একটি জাহাজে ক্যাপ্টেনের দায়িত্বলাভ করেছে। তার পরিবার রয়েছে অন্য জাহাজে। তারপর জাহাজটি হঠাৎ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সে তার জাহাজ নিয়ে তাদের উদ্ধার করে। পরদিন সকালে সে তার ভাই টমাসকে স্বপ্নের কথা বলে। বালক এড্রিন একদিন সত্যি সত্যি জাহাজের ক্যাপ্টেনে পরিণত হয়।

১৮৮০ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এ জাহাজ পরিচালনার ভার ছিলো ক্যাপ্টেন এড্রিন ক্রিস্টিয়ানের ওপর।

রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রার কয়েকদিন পর ক্যাপ্টেন এড্রিন স্বপ্ন দেখেন যে, একটি জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। স্বপ্নের শেষে 'ফ্যামিলি, শব্দটি অত্যন্ত জ্বলজ্বলভাবে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ছোটবেলার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় তার। পরদিন তিনি তার সন্ধান তৎপরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলেন।

পরবর্তী রাতে একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তার মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চারণ হয় যে, বিপদগ্রস্ত জাহাজটি তার নিজের জাহাজের উত্তরে রয়েছে।

অধীনস্থ অফিসারদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি তার জাহাজের গতি উত্তরে পরিবর্তিত করেন। দুদিন ক্রমাগত চলার পর তিনি দূর-দিগন্তে একটি নিমজ্জমান জাহাজের মাস্তুল দেখতে পান। বিপন্ন জাহাজের কাছে সময়মত পৌঁছতে পারায় ২৬৯টি প্রাণ রক্ষা পায়। এদের মধ্যে তার ভাই টমাসও ছিলেন। নিমজ্জিত জাহাজটির নাম ছিলো 'ফ্যামিলি,।

আট

অসুস্থতার সাথেও সম্ভবত স্বপ্নের বিরাট যোগাযোগ রয়েছে। মনস্তত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডিংটন ব্রস-এর জীবনে এমনি এক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, একটি বিড়াল আমার গলায় আঁচড় কাটার জন্যে তেড়ে আসছে। স্বপ্নটিকে এত বাস্তব মনে হচ্ছিল যে, আমার ঘুম ভেঙে গেল। ছয় মাসে কমপক্ষে বিশ বার আমি এ স্বপ্ন দেখি! প্রতিবারই আঁচড় কাটার পূর্ব মুহূর্তে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এরপর মাস পেরুতে না পেরুতেই অধ্যাপক ব্রস মারাত্মকভাবে ঠান্ডায় আক্রান্ত হন। অবস্থা জটীলাকার ধারণা করলে শরণাপন্ন হন একজন বিশেষজ্ঞের। পরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞ দেখতে পান যে, গলার মধ্যে একটা মাংসপেশী বিপজ্জনকভাবে বেড়ে উঠেছে।

তিনি অবিলম্বে গলায় অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। অস্ত্রোপচার করে বাড়তি মাংসপেশীটি অপসারণ করা হয়।

এরপর অধ্যাপক ব্রসকে আর কোনো বিড়াল আঁচড় কাটতে তেড়ে আসেনি। গলার ভেতর কিছু একটা গুগুগোল হচ্ছে- এ স্বপ্নটি নিশ্চয় সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছিলো। কিন্তু কজন তেমন স্বপ্নের সতর্কবাণীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন?

নয়

১৮১২ সাল। স্পেন্সার পার্সিভাল তখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ১০মে তিনি লর্ড হ্যারোবির আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি যথারীতি ঘুমাতে যান। নরম বিছানার পেলব স্পর্শে ক্লান্ত প্রধানমন্ত্রীর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি বিশি স্বপ্ন তার চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। সারারাত তিনি আর ঘুমাতে পারেননি। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে তিনি লর্ড হ্যারোবির নিকট রাতের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, 'বালিশে মাথা লাগাতে না লাগাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম, হাউজ অব কমন্সের লবির মধ্য দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। তার কোটের বোতামগুলো ছিলো পিতলের। কালবিলম্ব না করে সে আমাকে গুলি করল। মুহূর্ত মাত্র। তারপর আমার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

১১ মে বিকেলে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু করার কথা। লর্ড হ্যারোবি তার বন্ধুকে পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্যে চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্পেন্সার পার্সিভাল শুধুমাত্র একটি স্বপ্ন দ্বারা বিচলিত হতে অস্বীকৃতি জানালেন। লর্ড হ্যারোবির প্রচেষ্টা তাই ফলপ্রসূ হলো না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, স্বপ্নে তিনি যেভাবে তার মৃত্যু দেখেছিলেন, একইভাবে তিনি নিহত হন। প্রধানমন্ত্রীর হত্যাকারী বেলিংহামের পরনেও ছিলো সবুজ জ্যাকেট আর তার বোতামগুলোও ছিলো পিতলের।

দশ

ভারতের সাবেক গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার আগে আয়ারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন তার বন্ধু স্যার হেনরীর বাগানবাড়িতে।

একরাতে তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে তিনি এপাশ-ওপাশ করছিলেন। রাত গভীর হয়ে এলে আস্তে আস্তে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তিনি দেখেন অদ্ভুত এক স্বপ্ন।

তিনি স্বপ্ন দেখেন, কোনো কারণ ছাড়াই তার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হচ্ছে। কেমন যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত পাচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ তিনি বাইরে মৃদু পদশব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বাইরে এলেন। পূর্ণ চন্দ্রালোকে তিনি দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি কাঁধে একটা বিপুলাকার কালো কফিন নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কফিনের ভারে কফিনবাহী একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে।

লর্ড ডাফরিন দ্রুত গিয়ে লোকটির পথরোধ করে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন তার পরিচয়। জানতে চাইলেন সে কী বহন করছে।

লর্ড ডাফরিনের কথা শুনে লোকটি একটু সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল। আলোয় তিনি দেখলেন লোকটির বিশ্রী কদাকার চেহারা। লোকটির মুখে কোনো শব্দ নেই। দুচোখ দিয়ে যেন ঘৃণা বার পড়ছে। তাতে কদাকার মুখচ্ছবি হয়ে উঠছে আরও ভয়ঙ্কর।

অতি সাহসী ডাফরিন তবুও সাহস সঞ্চর করে লোকটির কাছে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু লোকটি কফিনসহ অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এমনিক ভেজা ঘাসের মধ্যে লোকটার কোনো পদচিহ্নও খুঁজে পেলেন না তিনি।

এরপর লর্ড ডাফরিনের ঘুম ভেঙে যায়। তার তখনকার মনের অবস্থা সহজেই বোধগম্য।

রাতের ওই প্রহরে কারো ঘুম আর ভাঙতে চাইলেন না তিনি। কিন্তু সকালে নাস্তার টেবিলে স্বপ্নের আগাগোড়া কাহিনী শোনালেন তার বন্ধুকে।

ডাফরিনের অনুরোধে হেনরী সারা গ্রামে খোঁজ নিলেন। না, সে রাতে গ্রামে কেউ মারা যায় নি। লর্ড ডাফরিনও গ্রামে ঘুরলেন। কিন্তু না, স্বপ্নে দেখা কদাকার লোকটির সাথে চেহারার সায়ুজ্য রয়েছে এমন কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না!

কয়েক বছর পরের কথা! লর্ড ডাফরিন তখন ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। এক সন্ধ্যায় তিনি একটি কূটনৈতিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে প্যারিসের গ্রান্ড হোটেল যান।

তিনি ও আরো কয়েকজন কূটনীতিক লিফটে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন! লিফটের দরজা খোলা হলে ডাফরিন তাতে প্রায় ঢুক পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ লিফট চালকের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন স্থাণুর মতো।

বিস্মিত আতঙ্কিত ডাফরিনের মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগে আয়ারল্যান্ডে দেখা স্বপ্নের কথা। লিফট চালকের মুখাবয়ব তো অবিকল সেই কফিনবাহকের মতো।

লর্ড ডাফরিন পিছিয়ে এলেন। সৌজন্যমূলক ক্ষমা চেয়ে বিরত থাকলেন লিফটে ঢোকা থেকে। লিফট ভর্তি হয়ে গেল এবং তা উঠতে লাগল ওপরের দিকে।

লর্ড ডাফরিন ডানপাশের কক্ষ গিয়ে ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলেন লিফট চালকের পরিচয়। কিন্তু ম্যানেজার কোনো কথা বলার আগেই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল হোটেল ভবন। কেবল ছিড়ে লিফট নিচে পড়ে যায়। লিফটটি বিধ্বস্ত হয় সম্পূর্ণরূপে। লিফটের ভেতর যারা ছিলেন, মারা যান তারা সবাই।

পরের দিনের সংবাদপত্রে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত হয়। অনেকে মত ব্যক্ত করেন, দুর্ঘটনাটি ছিলো একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কেউই আবিষ্কার করতে পারলেন না লিফট চালকের পরিচয়।

আর আয়ারল্যান্ডের সেই কফিন বাহকের সাথে লিফট চালকের কোনো যোগসূত্রও বের করতে সক্ষম হলেন না কেউ। কিন্তু সেই স্বপ্নই লর্ড ডাফরিনকে বাঁচিয়ে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে।

এগারো

১৯৭২ এর শেষ নাগাদ, সম্ভবত ডিসেম্বর মাস। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রফিকুল্লবী তখন আর্ট কলেজের শিক্ষক। একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন- পোস্ট অফিসের পিওন তাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠিতে লেখা আছে তাকে কোনো একটি দেশ স্কলারশিপ দিয়েছে উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে। শিগগিরই যেতে হবে ওখানে।

চিঠিটা পেয়ে অসম্ভব আনন্দ লাগছিল রফিকুল্লবীর। পরক্ষণেই তার ঘুমটা ভেঙে গেল। জেগে উঠে তার মনে হলো একটা সুন্দর জগৎ মাটি হয়ে গেছে একটু আগেই।

পরদিন যথারীতি কর্মস্থল আর্ট কলেজে গেলেন রফিকুল্লবী। সকাল ১১টায় ক্লাস নিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রিন্সিপাল (শফিক হোসেইন) ডেকে পাঠালেন তাকে।

রফিকুল্লবী ভাবলেন হয়তো ক্লাস সম্পর্কিত কোনো কথাবার্তা আছে। কিন্তু প্রিন্সিপালের কক্ষে গিয়ে যা শুনলেন তাতে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

ভেতরে একটা উত্তেজনাও বোধ করছিলেন। প্রিন্সিপাল তাকে জানালেন যে, গ্রীক সরকারের একটা বৃত্তি, কলেজ থেকে তার নাম পাঠানো হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে আজই কিছু কাগজপত্র পূরণ করে পাঠিয়ে দিতে হবে।

রফিকুল্লবী সে সময় মনে মনে প্যারিস অথবা লন্ডনে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। কিন্তু স্বপ্নটি এত তাড়াতাড়ি ফলে যাচ্ছে দেখে ভাবলেন কপালে গ্রীসই লেখা আছে হয়তো।

দ্বিরুক্তি না করে সব কাগজপত্র পূরণ করে পাঠিয়ে দিলেন। মাসখানেক পরই চিঠি পেলেন গ্রীসের স্কলারশিপটা তার হয়ে গেছে। পরের অক্টোবরেই রফিকুল্লবী গ্রীসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন টানা তিন বছরের জন্যে।

বারো

আনন্দময় স্বপ্ন দেখলে মনে চমৎকার একটা অনুভূতি জাগে। তেমনি খারাপ স্বপ্ন দেখলেও আমরা শিহরিত হই, ভয় পাই। একটা অজানা আশঙ্কার ছায়া যেন থেকে যায় কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন। তেমনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন কথাশিল্পী জুবাইদা গুলশান আরা।

সেসময় তিনি ডেনমার্কে ছিলেন। একদিন স্বপ্ন দেখলেন আকাশে একটা প্লেনে আগুন ধরে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে প্লেনটি। তারপর এই স্বপ্নের মধ্যেই দেখলেন আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানের পাইলটকে কাঠের কফিনে করে কবর দেয়া হলো।

ঘুম ভাঙার পর ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন জুবাইদা গুলশান আরা। তখন তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিমানের সাথে সংশ্লিষ্ট চাকরি করেন। তিনি তাদের খবরাখবর নিয়ে সতর্ক থাকতে বললেন।

এর ঠিক পরের মাসেই জুবাইদা গুলশান আরার সেই আত্মীয় এয়ার কমোডর বাশারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি তখন দেশে ফিরে এসেছেন। টেলিভিশনে যখন বাশারের মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা দেখছিলেন তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জুবাইদা গুলশান আরা। ঠিক এ ঘটনাটাই স্বপ্নে ঘটতে দেখেছিলেন তিনি।

(সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায়-১৩

আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ

১৯৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। কানাডার টরন্টো শহরের অধিবাসীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের টেলিভিশনের সামনে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের পর্দায় এমন দৃশ্য দেখানোর কথা, যা এর আগে কোথাও কোনো টেলিভিশনে দেখানো হয় নি।

নির্ধারিত মুহূর্তে ঘোষিকার ঘোষণা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পর্দায় দেখা গেল শহরের একজন পরিচিত পাদ্রি বিশপ পাইক একটি চেয়ারে বসে আছেন।

তার সামনেই বসে আছেন বিখ্যাত মিডিয়াম আর্থার ফোর্ড। আর্থার ফোর্ড 'ট্রান্সে, গিয়ে এক বছর আগে মৃত জেমস পাইক জুনিয়রের আত্মার সাথে আলাপ করবেন। জেমস পাইক জুনিয়র বিশপ পাইকের পুত্র।

বিশপের এই আলাপ অনুষ্ঠান দেখার জন্যেই টেলিভিশনের পর্দায় হাজার হাজার কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

টেলিভিশনের পর্দায় সম্পূর্ণ চল্লিশ মিনিট ধরে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন এ অনুষ্ঠান। আর্থার ফোর্ড কোনোদিন জেমস পাইক জুনিয়রের কথা না শুনলেও, তার মুখেই ভাষা পেল জেমস পাইকের আত্মা। মৃত জেমস পাইকের বন্ধু-বান্ধবরাও সেই মিডিয়ামের মুখ থেকে এমন সব কথা শুনলেন, যা শুধু তারাই জানতেন- বিশপ পাইক বা আর্থার ফোর্ড কারোরই তা জানার কথা নয়। বিশপ তার পুত্রের আত্মার কাছ থেকে অনেক কথা শুনলেন যা তিনি বহু আগেই ভুলে গিয়েছিলেন।

টরন্টো টেলিভিশন স্টুডিওতে জেমস পাইকের আত্মা আনয়নের মাধ্যমে আর্থার ফোর্ড বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। অবশ্য এটি তার জন্যে সাফল্যের চূড়ান্ত লগ্ন হলেও, তার মিডিয়াম জীবন বেশ দীর্ঘ, বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল।

আর্থার ফোর্ডের মিডিয়াম জীবন কার্যত শুরু হয় লন্ডনে। 'শার্লক হোমস, এর স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল একদিন লন্ডনে এক সুখী সমাবেশে অংশ নিচ্ছিলেন। তার বক্তৃতা শুরুর পূর্বেই একটি পরিচিতি পত্র নিয়ে তখনকার অখ্যাত ও তরুণ 'মিডিয়াম, আর্থার ফোর্ড হাজির হলেন তার কাছে। তিনি ফোর্ডকে তার অতীন্দ্রিয় প্রতিভা প্রদর্শনের জন্যে মঞ্চ আহবান করলেন। স্যার কোনান ডয়েল অনুষ্ঠান দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি মন্তব্য করেন যে, গত ৪১ বছরে

আমি অনেক অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। এর মধ্যে আজকের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বিস্ময়কর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে থাকাকালে আর্থার ফোর্ড তার অতীন্দ্রিয় প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হন। তিনি তখন ছিলেন ইলিনয়ের একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট।

একরাতে একটি নামের তালিকা দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে তার মনে হয়, এরা আজ রাতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যাবে। পরদিন তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন যে, তার ধারণাই ঠিক। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর শিকার হয়ে সে রাতে যেসব সৈনিক মারা গেছে, তাদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাই তিনি দেখেছিলেন স্বপ্নে। তেমনিভাবে স্বপ্নে দেখা পরবর্তী তালিকা থেকে তিনি যুদ্ধে কারা হতাহত হচ্ছেন তাদের নাম জানতে পারতেন।

এসব অতীন্দ্রিয় ঘটনা ঘটার পর আর্থার ফোর্ড তার মাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পরিবারে কারো মানসিক অসুস্থতা ছিল কি না। কারণ তিনি অভিজ্ঞতাসমূহের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাচ্ছিলেন না। মার কাছ থেকে জানতে পারেন তার এক চাচীর মানসিক ভারসাম্য ছিল না।

আসলে তার চাচী ছিলেন একজন মিডিয়াম। তাদের পরিবারের কঠোর ধর্মীয় গোঁড়ামিমণ্ডিত পরিবেশে তার চাচীর এ তৎপরতা ছিল সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তাই তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আখ্যায়িত করা হতো।

মিডিয়াম হিসেবে নিজের দুর্বলতার কথা ফোর্ড নিজেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, যখনই আমি আমার সচেতন মনকে সেনসর করার অনুমতি দিয়েছি, তখনই আমি ভুল করেছি। যখনই আমি নিজেকে কোনো চিন্তায় মগ্ন হতে দেখেছি, যেমন ধরুন-যখনই মনে করেছি- সম্ভবত ভদ্রলোকের নাম ত্রেগরি ব্লেগার, টেগরী হতে পারে না এবং এগুলোর বিকল্প হিসেবে কোনো শ্রুতিমধুর নাম বলেছি, তখনই আমি কার্যত ভুল করেছি। কিন্তু যখন আমি কোনো চিন্তা ছাড়াই যা শুনেছি বা দেখেছি, তা বলে গেছি, তখনই শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝ থেকে হাঁ সূচক সাড়া পেয়েছি।

মিডিয়াম জীবনের প্রথমদিকে ফোর্ড নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছেন। সচেতন মন ও চিন্তাকে দূরে রেখেছেন। ফলে ভুলও ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। তিনি ভাবতেন তার পেশাগত শৃঙ্খলার প্রয়োজন রয়েছে। পেশাগত শৃঙ্খলাই তাকে অতীন্দ্রিয় সিদ্ধিলাভে সক্ষম করবে।

মিডিয়াম হিসেবে ফোর্ডের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। জীবিতদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে আত্মাদের কাছেও যেন তিনি আরও প্রিয় হয়ে উঠলেন। তার অর্ধ-সম্মোহিত অবস্থায়

অশরীরী আত্মারা যেন তার চারপাশে ভীড় করতে লাগল। তার আত্মজীবনী 'নাথিং সো স্ট্রেঞ্জ'-এ তিনি লিখেছেন, কখনো কখনো আমি তাদের দেখতাম। কখনো কখনো আমি তাদের অনুভব করতাম। তা যাই হোক না কেন অধিকাংশ সময়ই তাদের সংখ্যা থাকত অনেক। আমি ভাবতাম তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তাদের অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্যে একটি পদ্ধতি অবশ্যই থাকা উচিত অথবা এমন কারো থাকা উচিত, যিনি হবেন অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব, অদৃশ্য থেকে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করবেন।

স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে আর্থার ফোর্ড লিখেছেন, ১৯২৪ সালে আমি একদিন অর্ধ সম্মোহিত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় এক অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব নিজেকে ফ্লেচার বলে পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন যে, এরপর থেকে তিনিই হবেন আমার অদৃশ্য জগতের স্থায়ী সহকারী।

ফ্লেচার অর্থাৎ ফোর্ডের ছেলেবেলার বন্ধুর ডাক নাম। সে ছিল ফরাসী-কানাডীয় বংশোদ্ভূত। পাঁচ বছর বয়সে তাদের পরিচয় হয়। তারা তখন থাকত ফ্লোরিডার ফোর্ট পিয়ার্সে। যুবক হিসেবে ফ্লেচারকে জানার সুযোগ ফোর্ডের হয়নি। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই তার বন্ধু ফ্লেচার মৃত্যুবরণ করে।

এরপর থেকে ফ্লেচার ফোর্ডের নিয়ন্ত্রক আত্মা হিসেবে কাজ করে এসেছে। অন্যান্য আত্মার বাণী বহন করে এনেছে ফোর্ডের কাছে।

ফ্লেচারের ইংরেজিতে ফরাসি টান সহজে ধরা যায়। তার ফরাসি টানই তার স্বরকে আর্থার ফোর্ডের স্বর থেকে পৃথক করেছে।

ফোর্ডের মিডিয়ামশীপে ফ্লেচারের অংশগ্রহণের পরপরই তার অতীন্দ্রিয় তৎপরতা আরো বেড়ে যায়। তিনি আরো দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

এই আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়েই তিনি তদানীন্তন বিশিষ্ট সাইকিক গবেষকদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত বৃটিশ আধ্যাত্মবাদী স্যার অলিভার লজ এবং স্যার কোনান ডয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তার বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল অতীন্দ্রিয় জীবনের কয়েকটি ঘটনা আমরা এখানে উল্লেখ করব। ১৯৩৯ সালে ফোর্ড নিউইয়র্কের কানোগি হলে নিজের প্রতিভা প্রদর্শন করছিলেন।

দর্শকদের মাঝে একজন তরুণ শুধুমাত্র তার মাকে সঙ্গদানের জন্যে সেখানে এসেছিলেন। ফোর্ড তার নাম পেয়ে গেলেন। নাম বললেন রালফ হ্যারিসন। তিনি তাকে সতর্ক করে বললেন, আপনি

যখন ব্যাংকে যাবেন তখন সতর্ক থাকবেন। আপনি আপনার সাথে সাধারণত উল্লেখযোগ্য অর্থ বহন করেন। সাবধানতা অবলম্বন না করলে শিগগিরই ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

হারিসন তাকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু তার কোম্পানির অফিস থেকে ব্যাংকে আগের মতো কোনোরকম পাহারা ছাড়াই নিজের গাড়িতে করে টাকা নিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখলেন। ফোর্ডের সতর্কবাণীর তিন সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই একদিন দুজন দুর্বৃত্ত অস্ত্রের মুখে তার দিনের জমা ছিনিয়ে নিয়ে সটকে পড়ে। হারিসন পরে নিজেই অতীন্দ্রিয়ের জগতে প্রবেশ করেন এবং একজন ক্লেয়ারভয়েন্ট হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আরেক সভায় ফোর্ড এক মহিলাকে বললেন যে, মৃত্যুর পরপার থেকে তিন ব্যক্তির বাণী তার কাছে আসছে। তারা একে অপরের হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

পরে ফোর্ড জানতে পারেন যে সে একজন সোসাইটি গার্ল। পর পর তার তিন স্বামী মারা গেছে। তার মৃত্যুর পর তার তিন স্বামী তাকে নিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারে এই তার আশঙ্কা।

আর্থার ফোর্ড মিডিয়ামদের ব্যক্তিজীবনের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, সবসময় সন্দেহবোধিত পরিবেশে বাস করলে তা মানুষের চরিত্রকে কিছুটা প্রভাবিত করে বৈ কি। পেশাদার মিডিয়ামদের বন্ধুবান্ধবহীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তারা বেশি দিলখোলা হওয়ার আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত থাকেন। কারণ যে-কোনো আড্ডায় তারা তাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে তথ্য জেনে ফেলতে এবং তা তাদের অর্ধসম্মোহিত অবস্থায় প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।

মিডিয়ামরা সাধারণত অনেকটা একঘরে। তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। তবুও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মিডিয়ামরা চির স্বাভাবিক মানুষ।

আর্থার ফোর্ডের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রথমে তার জীবনে আসেন সন্দেহবাদী হিসেবে। এদের মধ্যে প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক সিনক্লেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিনক্লেয়ার তার স্ত্রী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক উইলিয়াম ম্যাক ডুগালকে নিয়ে প্রথমত একটি সিয়াসেস অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বৈঠকের জন্যে ফোর্ডের নিকট আসেন। তারা তিনজন ফোর্ডকে যে পরীক্ষা করবেন স্থির করেছিলেন, তা ছিল পাঁচটি চিঠির ওপর ভিত্তি করে। পাঁচটি চিঠিই আপটন সিনক্লেয়ারের ফাইল থেকে নেয়া। পাঁচটির লেখকই মৃত।

পাঁচটি চিঠির একটি ছিল প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক জ্যাক লন্ডনের। দ্বিতীয় চিঠিটি ছিল স্যার কোনান ডয়েলের।

ফোর্ড অর্ধ সম্মোহিত অবস্থায় জ্যাক লন্ডনের আত্মা আনয়ন করেন। ফ্লেচার জ্যাক লন্ডনের বর্ণনা দেন এবং তার কয়েকটি বাণী সিনক্লেয়ারকে প্রদান করেন। জ্যাক লন্ডনের শেষ বাণীর শেষ লাইন হচ্ছে, আমার একটি চিঠি এখানে তোমার কাছে রয়েছে।

পরবর্তী সময়ে সিনক্লেয়ার ফোর্ডের বন্ধুতে পরিণত হন এবং বহু বৈঠকে অংশ নেন। এর একটি বৈঠকে তিনি ছোট্ট মেয়ের বাণী পান। সে জানায়, সে অল্প বয়সে মারা গেছে। সিনক্লেয়ারের এক পরিচিত মহিলাকে সে তার মা দাবি করে।

সিনক্লেয়ার নিশ্চিত ছিলেন যে, সে মহিলার কোনো কন্যা ছিল না। কিন্তু সিনক্লেয়ার সেই মহিলাকে ছোট্ট মেয়েটির বাণী প্রদান করলে মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিস্মিত সিনক্লেয়ারকে মহিলা জানান যে, তিনি একবার গর্ভপাত করেছিলেন। শিশু যে নামে নিজের পরিচয় প্রদান করেছে সে নাম তিনি তাকে গর্ভাবস্থায় দিয়েছিলেন।

আর্থার ফোর্ড আমেরিকার বিখ্যাত যাদুকর হ্যারি হুডিনির বিধবা স্ত্রীর সাথে এক বহুল প্রচারিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। হ্যারি হুডিনি মৃত্যুর পূর্বে তার স্ত্রীকে বলে যান যে, সম্ভব হলে মৃত্যুর পরপার থেকে তিনি তার সাথে যোগাযোগ করবেন। তার বাণী শনাক্তকরণের পাসওয়ার্ড হবে রোসাবেলে বিলিভ। 'রোসাবেলে, হচ্ছে হুডিনির প্রদর্শনীতে একদা অন্তর্ভুক্ত একটি গানের কলি।

আর্থার ফোর্ড একদিন অর্ধ সম্মোহিত অবস্থায় হ্যারি হুডিনির একটি বাণী পান। তিনি তা মিসেস হুডিনিকে জানান। পাসওয়ার্ড সংযুক্ত বাণী পেয়ে বিস্মিত মিসেস হুডিনি তাতে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর প্রদান করে বলেন যে, তার স্বামীর নিকট থেকে এটি হচ্ছে সঠিক বাণী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মিডিয়ামদের প্রতি মিসেস হুডিনির কোনো আস্থা ছিল না। তিনি ভণ্ড মিডিয়ামদের স্বরূপ উদঘাটন করে এ ঘটনা ঘটার আগে একটি বই লিখেছিলেন। তার বইয়ের ওপর ভিত্তি করে হলিউডে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে মানহানির ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

আত্মজীবনীতে আর্থার ফোর্ড লিখেছেন- সরকারি মহলের বহু দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কংগ্রেস সদস্য, সামরিক অফিসার, রাষ্ট্রদূত ও বহু অতি দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আমাকে বৈঠকে অংশ নিতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় এসব বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় আমাকে জানানো হতো না। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে এদের শনাক্ত করতে পারতাম।

১৯৩৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ফোর্ড একটি জনসমাবেশে অংশ নেন। তা সেখান থেকে বেতারে প্রচার করা হয়। তিনি শুধু সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের কাছেই আত্মার বাণী প্রদানের উদ্যোগ নেননি, বরং রেডিও শুনছে তাদেরও বাণী প্রদানের উদ্যোগ নেন।

সভা শেষ হওয়ার পরে বিভিন্ন স্থান থেকে ১৭টি টেলিফোন আসে! টেলিফোনকারীরা সম্পূর্ণ বাণীর সত্যতা স্বীকার করেন ও কৃতজ্ঞতা জানান। পরবর্তী সপ্তাহে একজন সংবাদপত্র সম্পাদক টেলিফোনকারীদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে শত শত মাইল পরিভ্রমণ করেন।

আর্থার ফোর্ড ১৮৯৬ সালে ফ্লোরিডার টিটুসভিলে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্লোরিডায়ই তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। তিনি বিয়ে করেন দুবার। দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা হয়নি। তার বলতে ছিল এক ছেলে। সেও নিহত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। কয়েক বছর আগে নিঃসঙ্গ আর্থার ফোর্ড গিয়ে ওঠেন ফিলাডেলফিয়ার একটি এপার্টমেন্ট হোটেলে। সেখানে তিনি তার নিঃসঙ্গ অবসর কাটাচ্ছেন আত্মাদের সাথে। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত)

অধ্যায়-১৪

আই চিং

বেদ-বাইবেলের চেয়েও প্রাচীন গ্রন্থ আই চিং। চীনের এই মহাগ্রন্থের নিয়মানুসারে মাত্র তিনটি মুদ্রা নিক্ষেপ করে একটি ষড়গ্রাম তৈরির মাধ্যমে আপনার যে-কোনো প্রশ্নের জবাব পেতে পারেন।

জীবনের যে-কোনো ক্রান্তিলগ্নে সিদ্ধান্ত নেয়াই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা। যুক্তি যেখানে সিদ্ধান্তের ফলাফল সম্পর্কে কোনো উপসংহার টানতে ব্যর্থ হয়, সেখানে এ সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।

তখন আমরা ভাবি প্রস্তাবিত কাজে হাত দেয়া ঠিক হবে কি? ঠিক হলে কখন শুরু করব? অমুকের সাহায্য পাব কি? পেলে এখন পাব? না সাহায্য পেতে দেরি হবে?

আদিকাল থেকেই মানুষ এ সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। এর সমাধানে বিভিন্ন দেশে বিকশিত হয়েছে অকাল্টের বিভিন্ন শাখা।

জ্ঞান ও সাধনার প্রাচীন পাদপীঠ চীনে জ্যোতিষবিজ্ঞান ছাড়াও এ সমস্যার সমাধানে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে। এ পদ্ধতিই পরবর্তী সময়ে 'আই চিং, (I CHING)' হিসেবে সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে।

তিনটি রেখার সমন্বয়ে গঠিত ৮টি 'ত্রিগ্রাম, (Trigram)' এর পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ৬টি রেখার ৬৪টি ষড়গ্রাম (Hexagram) থেকে যে-কোনো প্রশ্নের জবাব বা যে-কোনো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে এ বক্তব্য অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করলেই আই চিং-এর ব্যাখ্যার বাস্তব ভিত্তি পাব।

আই চিং-এর ষড়গ্রাম গঠিত হয় ৬টি রেখা দ্বারা। প্রতিটি রেখার রূপ নির্ভর করে আপনার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত মুদ্রার পিঠের ওপর।

আপনি ৬বার মুদ্রা নিক্ষেপ করছেন। আর এর ফলে তৈরি হচ্ছে ৬টি রেখা। ৬টি রেখার সমষ্টি হচ্ছে ষড়গ্রাম। তাই দেখা যাচ্ছে মুদ্রা নিক্ষেপের ওপরই ষড়গ্রামের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে। আর

মুদ্রা নিক্ষেপের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে আপনার অবচেতন মন (Sub-conscious mind)। আর আমরা জানি, সচেতন মনের (conscious mind) চেয়ে আমাদের অবচেতন মন অনেক বেশি দূরদৃষ্টির অধিকারী।

আই চিং-এর মাধ্যমে আমরা অবচেতন মনের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ক্ষমতাকে সচেতনতায় নিয়ে আসছি। এজন্যেই আই চিং থেকে আমাদের বুদ্ধির অগম্য পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

বিশ শতকে মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ কার্ল গুস্তভ ইয়ং, আই চিং-এর ৬৪ ষড়গ্রাম নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। তার দীর্ঘ পরীক্ষানিরীক্ষায় ষড়গ্রাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছে।

এস্ট্রলজির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ড. ইয়াং প্রবর্তিত মতবাদ 'দি থিউরি অব সিনক্রোনিসিটি, (The theory of Synchronicity)-এর উৎস হচ্ছে আই চিং।

সাধারণত কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে এস্ট্রলজিতে হোরারী চার্ট (Horary Chart) করা হয়ে থাকে। হোরারী চার্টের মধ্যে যেমন একটা প্যাটার্ন পাওয়া যায়, তেমনি আই চিং-এর ষড়গ্রাম থেকেও পাওয়া যায় একটি প্যাটার্ন। হোরারী চার্টের মতো এ প্যাটার্নের ব্যাখ্যাই হচ্ছে আপনার প্রশ্নের জবাব।

আই চিং-এর ইতিহাস

প্রায় ৫ হাজার বছর আগে চীনের বিখ্যাত সম্রাট ও পণ্ডিত ফু শি কচ্ছপের পিঠের দাগ দেখে প্রথম ৮টি ত্রিগ্রাম গঠন করেন। এই ভিতরে ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আই চিং-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সম্রাট ফু শি যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে মনের সন্দেহ ও প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আই চিং-এর ব্যবহার করতেন।

প্রাথমিক অবস্থায় আই চিং-এর দাগ পাওয়ার জন্যে কচ্ছপের পিঠ ব্যবহার করা হতো।

চৌ বংশের শাসনামলে নির্দিষ্ট সংখ্যক মিলফয়েল বৃত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নয়া পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।

বৃত্ত ব্যবহারের ফলে আই চিং থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে। চৌ বংশের (খ্রীষ্টপূর্ব ১১৫০-২৪৯) প্রতিষ্ঠাতা কিং ওয়েন এবং তার পুত্র চৌ কাং, আই চিং-এর ৬৪টি ষড়গ্রামকে নির্দিষ্ট ধারায় সজ্জিত করেন।

চীনের বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা কনফুসিয়াস আই চিং-এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে কনফুসিয়াস আই চিং-এর প্রতি অনীহা পোষণ করতেন। ৭০ বছর বয়সে তিনি আই চিং-এর প্রতি আকৃষ্ট হন।

তিনি আই চিং নিয়ে এত বেশি চিন্তা করতেন যে, আই চিং রাখার চামড়ার ব্যাগ তিন বার জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। কনফুসিয়াস মৃত্যুর আগে আক্ষেপ করে গেছেন, 'আমার জীবনের সাথে যদি আরো কয়েক বছর যোগ হতো তবে আই চিং-এর সাধনায় আমি ৫০ বছর ব্যয় করতাম এবং জীবনে যেসব বড় বড় ভুল করেছি, সেগুলো এড়াতে পারতাম।

দার্শনিক ধর্মবেত্তা কনফুসিয়াস আই চিং-এর মূল গ্রন্থ ও তার সাথে যে পরিশিষ্ট সংযোজন করেছিলেন, তাই শতাব্দী পরিক্রমায় আই চিং হিসেবে চলে এসেছে।

আই চিং-এর ধারণা

চীনা ভাষায় 'আই, শব্দের অর্থ 'পরিবর্তন', 'চিং, শব্দের অর্থ গ্রন্থ। আই চিং তাই পরিবর্তনের গ্রন্থ। আই চিং-এর অনুসৃত পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ৮টি ত্রিগ্রাম।

৮টি ত্রিগ্রাম মহাবিশ্বের ৮টি মৌলিক বিষয়ের (Factor) প্রতীক।

৮টি ত্রিগ্রাম আবার পারস্পরিক সম্মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে ৬৪টি ষড়গ্রামের। প্রতিটি ষড়গ্রাম মানুষ বা প্রকৃতির এক বা একাধিক প্রপঞ্চের (Phenomena) প্রতীক।

আই চিং-এর ধারণা অনুসারে, সবগুলো ষড়গ্রাম সৃষ্টির সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতি বা অবস্থার প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর বাস্তবতা, জনপ্রিয়তা ও এর সহজ প্রতীক চীনের অকাল্ট সাধকদের অসাধারণ সাফল্যের বহিঃপ্রকাশ। আই চিং-এর সাফল্য হচ্ছে, এতে প্রকৃতির জটিলতাকে সহজতম প্রতীকের মাঝে মূর্ত করা হয়েছে।

'আই, শব্দের মূল কথাই হচ্ছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তন প্রতিনিয়তের পরিবর্তন। এ পরিবর্তন প্রতিটি বস্তুর পরিবর্তন।

এ পরিবর্তন গতিশীল। বার্নার ধারে দাঁড়িয়ে, বার্নাকে লক্ষ করে কনফুসিয়াস বলেছিলেন- 'আহ! বার্নাধারার এ গতি অনন্ত। এর দিনও নেই রাতও নেই।

বিশ্বে পরিবর্তনের ধারাও এই একই রকম।

আই চিং দর্শন অনুসারে প্রতিটি পরিবর্তন ও রূপান্তর হচ্ছে গতির ফলশ্রুতি। মহাবিশ্বের দুটি মৌলিক শক্তি রয়েছে। একটি ইয়াং (সক্রিয়, পুরুষাত্মক, ইতিবাচক) অপরটি ইন (নিষ্ক্রিয়, স্ত্রীবাচক, নেতিবাচক)। এই দুটি মৌল শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই সকল পরিবর্তন ঘটে।

আই চিং-এ ইতিবাচক শক্তির (পুরুষাত্মক শক্তির) প্রতীক হচ্ছে একটি সরলরেখা ———। নেতিবাচক শক্তির (স্ত্রীবাচক) প্রতীক হচ্ছে একটি ভগ্ন রেখা — — এই দুটি শক্তির ক্রিয়ার ফলে গঠিত হচ্ছে ৪টি 'শিয়াং' :

প্রধান ইয়াং == প্রধান ইন == ছোট ইয়াং == ছোট ইন ==

এ ৪টি শিয়াং-এর পারস্পরিক বাক্রিয়ায় ৮টি ত্রিগ্রামের (Trigram) উদ্ভব। প্রতিটি ত্রিগ্রাম তিনটি রেখা দ্বারা গঠিত। এর রেখা অবশ্য সরল বা ভগ্ন হতে পারে।

১।	চিয়েন	☰	এটি অদম্য শক্তি আর ক্ষমতার প্রতীক।
২।	কুন	☷	এটি ধারণ-ক্ষমতা ও বশ্যতার প্রতীক।
৩।	চেন	☱	এটি গতিশীল ও উত্তেজক শক্তির প্রতীক।
৪।	লি	☲	এটি ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের প্রতীক।
৫।	টুই	☴	এটি আনন্দ, স্বস্তি ও সন্তোষ-এর প্রতীক।
৬।	সান	☵	এটি নমনীয়তা, গভীরতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক।
৭।	কান	☶	এটি বিপদ, বিপর্যয় ও বাধার প্রতীক।
৮।	কেন্	☳	এটি স্থবিরতা ও আবদ্ধতার প্রতীক।

আই চিং দর্শন অনুসারে ৮টি ত্রিগ্রামের প্রতীকী শক্তিগুলোই বিশ্ব চালিকাশক্তির উপাদান। এই ত্রিগ্রামগুলোর যে-কোনো দুটির সমন্বয়ে গঠিত হয় ৬টি রেখার একটি ষড়গ্রাম (Hexagram)। এভাবে ৮টি ত্রিগ্রামের সাথে ৮টিকে মিশিয়ে ৬৪টি সমন্বয় পাওয়া যায়। আই চিং-এর ষড়গ্রামও ৬৪টি। এই ৬৪টি ষড়গ্রাম প্রকৃতির সম্ভাব্য যে-কোনো অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি- আই চিং-এর ৬৪টি ষড়গ্রাম ২টি ত্রিগ্রামের মিশ্রণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই ২টি ত্রিগ্রাম সময়ের ক্ষেত্রে অতীত ও ভবিষ্যতের, স্থানের ক্ষেত্রে উচ্চতা ও গভীরতার প্রতিভূ। স্থান ও কাল হচ্ছে আই চিং-এর আধ্যাত্মিকতাবাদের অন্যতম মৌল ধারণা।

'আই'-এর ব্যাখ্যা অনুসারে সময় ও পরিস্থিতির বিপরীতে কোনো অগ্রগতি হতে পারে না। অর্থাৎ সাফল্যের জন্যে কোনো অগ্রগতি যথাযথ সময় ও পরিস্থিতিতেই সম্ভব। আর ৬৪টি ষড়গ্রাম থেকে স্থান ও কালের বিচারে সবচেয়ে ভালো পদক্ষেপ কী হবে সে তথ্যই পাওয়া যেতে পারে।

আই চিং থেকে আপনার প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যে প্রথমত আপনাকে ষড়গ্রাম প্রস্তুতের প্রণালী শিখতে হবে। প্রথম আপনাকে আই চিং মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে। আই চিং মুদ্রার এক পিঠে মঙ্গলের প্রতীক ও অন্য পিঠে শুক্রের প্রতীক থাকবে।

আই চিং মুদ্রার অভাবে আপনি বাংলাদেশের ২৫ পয়সার মুদ্রাও ব্যবহার করতে পারেন। মুদ্রার দুই পিঠ প্রকৃতির দুইটি গুণের প্রতিনিধি। আই চিং মুদ্রার মঙ্গল গ্রহের পিঠ (বাংলাদেশি মুদ্রার বাঘ অঙ্কিত পিঠ) ইয়াং যা ইতিবাচক (+) শক্তির প্রতীক। এর মান হচ্ছে ৩। আর আই চিং মুদ্রার শুক্র গ্রহের পিঠ (বাংলাদেশি মুদ্রার শাপলা অঙ্কিত পিঠ) হচ্ছে ইন বা নেতিবাচক (-) শক্তির প্রতীক। এর মান হচ্ছে ২।

এবার আপনাকে তিনটি মুদ্রা নিতে হবে। ডান হাতের মুঠোয় আলতোভাবে নিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে আপনার সামনে ফেলুন। তিনটি মুদ্রাই এরকম ৬ বার ফেলতে হবে। প্রতিটি নিক্ষেপলব্ধ ফল আপনার ষড়গ্রামের এক একটি লাইন। আপনার নিক্ষিপ্ত মুদ্রার নিম্নোক্ত যেকোনো একটি সমন্বয় সৃষ্টি হবে :

পিতৃরেখা	৩ মঙ্গল বা বাঘ	—
	৩+৩+৩=৯	
স্ত্রীর রেখা	২ মঙ্গল বা বাঘ এবং ১ শুক্র বা শাপলা	—
	৩+৩+২=৮	
স্ত্রীর রেখা	২ শুক্র বা শাপলা ও ১ মঙ্গল বা বাঘ	--
	২+২+৩=৭	
মাতৃরেখা	৩ শুক্র বা শাপলা	--
	২+২+২=৬	

আপনার মুদ্রা নিক্ষেপের যোগফল ৮ বা ৯ হলে রেখাটি হবে সরল রেখা। আর যোগফল ৬ ও ৭ হলে রেখাটি হবে ভগ্ন রেখা। আপনার প্রত্যেক নিক্ষেপে ষড়গ্রামের এক একটি রেখা গঠিত হবে। ষড়গ্রামের রেখাগুলো নিচ থেকে উপরে উঠবে। যেমন :

৬ষ্ঠ নিক্ষেপ----- ৬ষ্ঠ রেখা

৫ম নিক্ষেপ----- ৫ম রেখা

৪র্থ নিক্ষেপ----- ৪র্থ রেখা

৩য় নিক্ষেপ----- ৩য় রেখা

২য় নিক্ষেপ----- ২য় রেখা

১ম নিক্ষেপ----- ১ম রেখা

পরপর আই চিং মুদ্রা ৬ বার নিক্ষেপের ফলে সৃষ্ট ৬টি রেখাই আপনার ষড়গ্রামের ৬টি রেখা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আপনার কী করা উচিত, তা এই ষড়গ্রামের ব্যাখ্যা- ষড়গ্রামের প্রতিটি রেখার ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারবেন।

আই চিং-এর ৬৪টি ষড়গ্রাম ও ৬৪টি ষড়গ্রামের ৩৮৪টি রেখার বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী, পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

কনফুসিয়াসের আমলের মূল গ্রন্থের কলেবরও বেড়েছে অনেক। কিন্তু আমাদের বর্তমান নিবন্ধের আওতায় ৬৪টি ষড়গ্রামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আমরা এখানে প্রতিটি ষড়গ্রামের মর্মার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করব। ষড়গ্রামের সাথে মিলিয়ে আপনার প্রশ্নের জবাব দেখে নিন।

আই চিং

৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
পাই ১৬	শিন ১৫	সাঙ ১৪	সু ১৩	মেঙ ১২	চুন ১১	কুন ১০	চিয়েন ৯
উ ২৪	টায়ান ২৩	তা উ ২২	তুংজেন ২১	পেই ২০	তাই ১৯	লু ১৮	সিয়াও চু ১৭
ফু ৩২	পো ৩১	পি ৩০	শি ছ ২৯	কুয়ান ২৮	লিন ২৭	কু ২৬	সুই ২৫
হেঙ ৪০	সিয়েন ৩৯	লী ৩৮	কান ৩৭	তাকুয়ো ৩৬	আই ৩৫	তা চু ৩৪	ওয়াওয়াং ৩৩
সিয়েহ ৪৮	চাইয়েন ৪৭	কুয়েই ৪৬	চিয়াজেন ৪৫	মিঙআই ৪৪	চিন ৪৩	তাকুয়াং ৪২	তুন ৪১
চিঙ ৫৬	খোয়ান ৫৫	শেঙ ৫৪	সুআই ৫৩	কোউ ৫২	কুয়াই ৫১	ওয়াই ৫০	সান ৪৯
লা ৬৪	ফেঙ ৬৩	কুইমেই ৬২	কিয়েন ৬১	কেন ৬০	চেন ৫৯	টিঙ ৫৮	কো ৫৭
ওয়াইচি	চিচি	সিয়াওকুয়ো	কংফু	কিয়েহ	হুয়ান	টুই	সুন



১। শক্তির দৃঢ়তার প্রতীক : দৃঢ়তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা আপনার সাফল্য বয়ে আনবে।



২। নিবেদন ও আত্মসমর্পণের প্রতীক : আপনার ধৈর্য ও অধ্যবসায় আপনাকে পুরস্কৃত করবে। কিন্তু যদি তাড়নাবশত কাজ সম্পন্ন করতে যান তাহলে আপনি দেখবেন আপনার উদ্যোগ বিফল হয়েছে।



৩। প্রাথমিক অসুবিধা ও বামেলার প্রতীক : আপনার সামনে সুযোগ আসার সাথে সাথে বাধাও আসবে। এতে হতাশ হবার কিছু নেই। কার্যত পরিস্থিতি আপনারই অনুকূলে।



৪। অনভিজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তার প্রতীক : একসাথে অনেক কিছু করার চেষ্টা করবেন না। নিজের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত থাকুন। আপনার ভুলের জন্যে যে বাধাগুলো সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করুন। তাহলেই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।



৫। বিলম্ব ও অপেক্ষার প্রতীক : দেরিতে হলেও আপনার ইচ্ছা বাস্তব রূপ লাভ করবে।



৬। দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রতীক : দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আসন্ন। অন্যদের সাথে বিরোধ এড়িয়ে চলুন।



৭। সম্মিলিত তৎপরতা ও ব্যাপকতার প্রতীক : দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে আপনি বিজয়ী হবেন। একজন সহজাত যোদ্ধার ন্যায় আপনি জানেন কখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অগ্রসর হতে দিতে হবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লান্ত হওয়ার পর কখন নিজে এগিয়ে যেতে হবে।



৮। মিলন ও সহযোগিতার প্রতীক : আপনার আশা বাস্তবায়িত হবে। তবে আপনি সত্যি কী চান ও কিসে আপনি সুখী হবেন সে সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হতে হবে।



সিয়াও চু

৯। কিষ্কিণী বাধা ও বশীভূত শক্তির প্রতীক : আপনি যত তাড়াতাড়ি চাচ্ছেন, ভাগ্য তত তাড়াতাড়ি আপনার প্রতি প্রসন্ন হবে না। ধৈর্য ধরুন। তাড়াছড়ো করে কিছু করতে গেলে আপনি বরং পিছিয়ে যাবেন।



লু

১০। সতর্কতা ও সূচিস্থিত পদক্ষেপের প্রতীক : আপনার বিনয়ী হওয়া উচিত। আপনার সত্যিকারের যোগ্যতার চেয়ে বেশি যোগ্যতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আপনার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু করার চেষ্টা করলে পরিণামে ব্যর্থ হবেন।



তাই

১১। শান্তি, অগ্রগতি ও সাফল্যের প্রতীক : শিগগিরই আপনার জীবনে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসবে। আপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। তবে এবার আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছেন বলে ধরে নেবেন না।



পেই

১২। স্থবিরতা ও ব্যর্থতার প্রতীক : অন্যরা আপনাকে স্বার্থপর ও কপট বলে ভাববে। তারা মনে করবে তাদের ঘাড়ে পা রেখে নিজে উপরে ওঠার পরিকল্পনা করেছেন। আপনি যাদের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে বিশ্বাসের মনোভাব জাগাতে চেষ্টা করুন। তাহলেই তারা আপনার পক্ষে থাকবে।



তুংজেন

১৩। সমর্মিতাবোধের প্রতীক : আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবেই এই আত্মবিশ্বাসে নিজেকে বলীয়ান করুন।



তা উ

১৪। প্রাচুর্য ও সাফল্যের প্রতীক : অন্যান্যের সাথে আপনার সম্পর্ক এবং আপনার ওপর সাধারণের বিশ্বাস আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি। আপনি বিরাট সাফল্যের অধিকারী হবেন।



টায়ান

১৫। বিনয় ও নম্রতার প্রতীক : আপনার বিনয় ও নম্রতার জন্যে অন্যদের কাছে আপনি হয়ে উঠবেন রহস্যময়। সাফল্য আপনার এমনি আসবে। সাফল্যের জন্যে দৌড়ালেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



উ

১৬। আনন্দ-উদ্যমের প্রতীক : সাফল্য অবশ্যই আসবে। কিন্তু বর্তমানের অসুবিধার জন্যে এটা অনুধাবন করা আপনার জন্যে কষ্টকর হতে পারে।



সুই

১৭। উত্তরাধিকার ও অনুসরণের প্রতীক : গুরুজনের নিকট থেকে পথনির্দেশ লাভ ও তার উপদেশ অনুসরণের মাধ্যমেই আপনার সাফল্য আসবে।



কু

১৮। অবক্ষয়, ধ্বংস ও অভ্যুত্থানের প্রতীক : আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগের সময় উপস্থিত। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে বাধার মোকাবেলা করতে হবে।



লিন

১৯। অভিগমন ও অগ্রগতির প্রতীক : সুযোগ আপনার সামনে দিয়ে চলে যেতে পারে। আপনাকে অগ্রসর হয়ে সুযোগকে ধরতে হবে ও কাজে লাগাতে হবে। বেহেশতি মেওয়ার মতো সুযোগ সরাসরি আপনার হাতে এসে ধরা দেবে না।



কুয়ান

২০। পর্যবেক্ষণ ও অনুধ্যানের প্রতীক : পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে যাচ্ছে না। যথার্থভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করুন। সাফল্যের পথে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পরিকল্পনা করে নিজের শক্তিকে সংহত করে অভিযান চালান।



শি হু

২১। বৈধ কার্যধারা ও অগ্রগতির প্রতীক : আপনার লক্ষ্যের তুলনায় আপনি কোথায় অবস্থান করছেন সে সম্পর্কে সচেতনতায়ই আপনার সাফল্য নির্ভর করবে। আপনি যে রকম ভাবছেন, সম্ভবত পরিস্থিতি তার চেয়ে ভালো।



পি

২২। অলংকার ও মডেলের প্রতীক : গ্লামার সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। বাহ্যিক চাকচিক্য আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে।



পো

২৩। বিভক্তি, পতন ও বিক্ষিপ্ততার প্রতীক : অন্যের ওপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করে আত্মনির্ভর ও সতর্ক হতে হবে। তা না হলে আপনার অগ্রগতির অবক্ষয় শুরু হবে।



ফু

২৪। প্রত্যাবর্তন ও পটপরিবর্তনের প্রতীক : অগ্রগতির পথে আপনার বাধাগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিই আপনার সমস্যার সমাধান করবে।



ওয়াওয়াং

২৫। শান্তি থেকে মুক্তি, নিষ্পাপতার প্রতীক : আপনাকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে। তাড়াহড়ো করে কাজ করা থেকে সতর্ক থাকুন। তাড়াহড়ো করে কিছু করলে পরিস্থিতি আরো অনিশ্চিত হয়ে উঠবে।



তা ছাড়া

২৬। সত্যম ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক : এখন ধৈর্য ধরার সময়। কাজে হাত দেয়ার সময় নয়। কোনো কাজে হাত দেবেন না। আগে বাড়ার চেয়ে চুপচাপ বসে থেকেই আপনি বেশি কাজ হাসিল করতে পারবেন।



আই

২৭। জীবন সংগ্রামের প্রতীক : আপনাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। আপনার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞদের উপদেশ শুনতে হবে। সমস্যার সমাধানে ধৈর্য অবলম্বন করুন। তাড়াহুড়া নয়, কঠিন পরিশ্রম করে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে আপনার সমস্যার সমাধান হবে।



তাকুয়ো

২৮। বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমণের প্রতীক : আপনার গতি কমান। আপনি খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি লাফ দিচ্ছেন। যে-কোনো সময় হেঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে যেতে পারেন। দৃষ্টিভ্রান্তর জন্যে এ সময়ে অন্যান্যের পরামর্শ শোনা আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে। কিন্তু পরামর্শ শোনাই আপনার জন্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।



কান

২৯। নিমজ্জন ও তলিয়ে যাওয়ার প্রতীক : আপনার অস্তিত্বের লড়াইয়ে আরেকজন জড়িয়ে যাবে। পরিস্থিতিকে জোড়াতালি দিয়ে অনুকূলে রাখতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তাই সতর্ক থাকুন। তা না হলে আপনি আরো তলিয়ে যাবেন।



जी

৩০। আনুগত্য ও উজ্জ্বল্যের প্রতীক : আপনি মনে করছেন, সবকিছু আপনার অনুকূলে রয়েছে। কিন্তু আসলে আপনি পরিস্থিতি যত ভালো ভাবছেন তা ততটা ভালো নয়। বর্তমানে যারা আপনার ওপর নির্ভরশীল, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। কারণ সময় এলে বাস্তবতার মোকাবেলায় এদের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।



সিগ্নেল

৩১। প্রভাব ও পারস্পরিক প্রভাবের প্রতীক : আপনার অকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা ও অন্যদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা অসাধারণ। তাই আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাধারণের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।



৩২। দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের প্রতীক : আপনি নিজেকে উভয় সংকটের মধ্যে নিষ্কিণ্টু দেখতে পাবেন। দুটি লক্ষ্যের কোনদিকে যাবেন, তা ঠিক করা কঠিন হতে পারে। আপনি বিরক্ত হয়ে তৃতীয় কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারেন। পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে আপনাকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে।



৩৩। পশ্চাদপসারণ ও প্রত্যাবর্তনের প্রতীক : এখন সময় এসেছে লাগাম লাগানোর, আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করুন। অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলে আপনি গর্তের মধ্যে ঢুকে যাবেন।



৩৪। বিরাট শক্তি ও মহান ক্ষমতার প্রতীক : ভাগ্য এখন আপনার হাতে। তবে আপনার মধ্যে ঔদ্ধত্য ও গর্বের প্রকাশ ঘটতে পারে। অন্যদের কাছে আপনি অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন। তারা আপনার সম্পর্কে ভীত হয়ে দূরে সরে যেতে পারে। আর তা আপনার সফলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।



৩৫। উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতীক : ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আপনার লক্ষ্য অর্জিত হবে। এসময় আপনাকে আলস্য পরিহার করতে হবে। কারণ এসময় কঠিন পরিশ্রম প্রয়োজন।



৩৬। অনুজ্জ্বল আলো ও উপলব্ধির অভাবের প্রতীক : আপনার মনে হতে পারে অনেক কিছু আপনার সাফল্যের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এ অন্তরায়গুলোকে পাত্তা দেবেন না। লক্ষ্যে পৌঁছাই এখন সবচেয়ে সহজ। যা কিছু কঠিন মনে হচ্ছে তা ক্রমান্বয়ে সহজ হয়ে আসবে।



৩৭। পরিবারের প্রতীক : আপনার মধ্যে অতিরিক্ত কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি আপনার বিরুদ্ধে কাজ করবে।



৩৮। অনৈক্য, বিভেদ ও বিরোধিতার প্রতীক : আপনার সাথে অন্যদের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আপনার মনে হচ্ছে এটি আপনার বিরুদ্ধে সংঘাতের রূপ নেবে। আপনি যতটা মনে করছেন, আসলে পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয়। অনিশ্চয়তার কালো মেঘ শিগগিরই দূর হয়ে যাবে।



৩৯। বাধা ও প্রতিবন্ধকতার প্রতীক : বাধাকে অতিক্রম করা এখন অত্যন্ত কঠিন হবে। অনুমিত হচ্ছে যে, আপনি যত শক্ত উদ্যোগ নেবেন, ততই জালে জড়িয়ে পড়বেন। অবসরমূলক তৎপরতায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার এটাই উপযুক্ত সময়।



৪০। শিথিলতা ও মুক্তির প্রতীক : দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনি সাফল্য লাভ করবেন। নতুন পরিকল্পনায় কাজ শুরু করা বেশ কঠিন হতে পারে। কিন্তু শুরু করাই সংগ্রামের প্রায় সবটুকু।



৪১। ঘাটতি, কমতি ও অবনতির প্রতীক : নিজের জন্যে এখন কিছু করবেন না। অন্য কারো প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করুন। ভবিষ্যতে এর সুফল পাবেন। আশুলাভের জন্যে কোনো পদক্ষেপ নিলে তা বার্থ্য হবে। দূর ভবিষ্যতকে সামনে রেখে কিছু করলে, সময় এলে তার সুফল পাবেন।



৪২। বুদ্ধি ও সংযোজনের প্রতীক : অন্যদের সাহায্য করার জন্যে আপনার সময় ও শ্রম নিয়োজিত করুন। সৌভাগ্য আপনার ধারে-কাছেই রয়েছে। শিগগিরই জীবন সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।



৪৩। অভ্যদয় ও সুদৃঢ়তার প্রতীক : আপনি যে-কোনো ক্ষেত্রে অন্যদের পরাভূত করে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন হবেন। যাই হোক, এই নতুন মর্যাদায় উন্নীত হবার পর আপনার আত্মবিশ্বাস আপনার বিরুদ্ধেই যেতে পারে।



৪৪। অনাগত ঘটনার প্রতীক : তিল শেষ পর্যন্ত তালে পরিণত হতে পারে। কোনো ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।



৪৫। সম্মিলন ও একীভূত হওয়ার প্রতীক : সাফল্য নিকটবর্তী কিন্তু অতীত কর্মপ্রচেষ্টার ফল
উপভোগ করার জন্যে আপনাকে অবশ্যই আপনার বর্তমান বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজনের সাথে
সম্পর্ক উন্নত করতে হবে।



৪৬। উত্থান ও অগ্রগতির প্রতীক : আপনি বর্তমানে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে আপনি সফল হবেন। তবে দীর্ঘ পথে আপনি সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছেন। অনেক বাধা আসবে।



৪৭। উৎপীড়ন ও দমনের প্রতীক : এটি দুঃখ ও দুর্ভোগের ইঙ্গিত দেয়। যদিও কঠিন তবুও নিজের জন্যে দুঃখ করা থেকে বিরত থাকুন। সাহস ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করুন। অভিজ্ঞ ও পেশাদার ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সাহায্য নিন।



৪৮। কৃপ ও উৎসবের প্রতীক : সবকিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে না প্রতিকূলে যাচ্ছে তাও আপনি বুঝতে পারছেন না। অন্যদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করুন। তাহলেই পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে মোড় নেবে।



৪৯। বিপ্লব ও পরিবর্তনের প্রতীক : প্রয়োজনীয় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। যদি মনে করেন পরিবর্তন আসন্ন তবে তা আনতে উদ্যোগ নেন। এটা আপনার জন্যে কল্যাণকর হবে।



৫০। ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রতীক : সৌভাগ্য সন্নিহিত। পুরাতনকে পরিহার করে নতুন কিছু শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়। নেতৃত্ব গ্রহণ করার সুযোগ আসতে পারে। এ সুযোগ আপনার অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।



৫১। আকস্মিক উত্তেজক শক্তির প্রতীক : হঠাৎ পরিবর্তনে আপনি উৎকর্ষিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এটা আপনার জন্যে সুফলদায়ক হবে। এ পরিবর্তনই আপনার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সাফল্য আনবে।



৫২। স্থিতিশীলতা ও আবদ্ধতার প্রতীক : আপনি একটা স্থবির অবস্থায় পৌঁছেছেন, কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার জন্যে শক্তি নিয়োগ করলে পিছিয়ে যেতে পারেন। ধৈর্য ধারণ করুন। এখন বরং আপনার মনে সৃষ্ট দ্বিধাগুলো দূর করার কাজে মনোনিবেশ করুন।



৫৩। ক্রমিক অগ্রগতির প্রতীক : ধীরে অগ্রসর হোন। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। যে সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারি। তাই সময় নিয়ে ভালোভাবে ভেবে সিদ্ধান্ত নেন।



৫৪। বিয়ের প্রতীক : ব্যবসা বা রোমাসের ক্ষেত্রে আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন। এ থেকে পরবর্তী সময় সমস্যার উদ্ভব হবে। গ্লামার দেখে প্রতারিত হবেন না।



৫৫। প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক : অর্থ ও সাফল্য দুইই আপনার আসবে। তবে সতর্ক থাকুন। কারণ অসতর্কতা ও লোভের ফলে জীবনের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিককে এড়িয়ে যেতে পারেন। আর তা আপনার জন্যে অশান্তি ডেকে আনবে।



৫৬। ভ্রমণ ও বিচরণের প্রতীক : এবার ভ্রমণ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে লাভজনক হতে পারে। জ্ঞান ও কৌশলের অভাবের জন্যে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।



সুন

৫৭। কোমলতা ও দূরদৃষ্টির প্রতীক : বিনয়ী ও নম্র হওয়ার সময় এটাই। যে-কোনো ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তের অভাব রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি যাদের শ্রদ্ধা করেন তাদের পরামর্শ নিন।



টুই

৫৮। আনন্দ ও উৎফুল্লতার প্রতীক : সবকিছুই ভালো যাবে। আপনি অত্যন্ত আনন্দিত ও মুক্ত থাকবেন। কিন্তু এরপরে যে পরিস্থিতি আসতে যাচ্ছে তা এখন থেকেই আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে।



হুয়ান

৫৯। শৈথিল্য ও ব্যাধির প্রতীক : আপনি দুর্গম পর্বতে আরোহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনার বিশ্বাস ও দৃঢ়তাই আপনাকে শিখরে পৌঁছাতে পারে।



কিয়েহ

৬০। বিধি ও সীমাবদ্ধতার প্রতীক : আপনি যদি সতর্কতার সাথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন, তবে আপনার পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সফল হবে। কোনো বাধা পেয়ে হতোদ্যম হবেন না। কারণ আপনি লক্ষ্যে পৌঁছাবেন।



কংফু

৬১। আন্তরিকতা ও সত্যের প্রতীক : সদিচ্ছা ও আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। তাহলে আপনি চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন। আর যথাসময়ে আপনার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।



সিয়াংকুয়ো

৬২। প্রভাব ও আধিক্যের প্রতীক : সফলতা অর্জনের জন্যে খাঁটি পটভূমি প্রয়োজন। তা না হলে আপনার আশু সাফল্য অব্যাহত থাকবে না। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন না করা পর্যন্ত ধীরে চলুন।



চিচি

৬৩। সমাপ্তি ও সাফল্যের প্রতীক : সাফল্য আসবে। কিন্তু আপনার তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা সাফল্যকে নস্যাত্ন করে দিতে পারে।



গুয়েইচি

৬৪। দূরায়ত সাফল্যের প্রতীক : সাফল্য আপনার আসবে। কিন্তু এখন তার সময় নয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হোন। পরিস্থিতি আপনার আরো অনুকূল হবে। নতুন কিছু শুরু করার সুযোগ আসবে।

উপসংহার : একটি বিশেষ প্রশ্নের জবাবে শুধুমাত্র একবারই ষড়গ্রাম তৈরি করুন । ষড়গ্রামের জবাব আপনার কাছে স্পষ্ট না হলে প্রশ্নটি পরিবর্তন করে লিখুন ও ষড়গ্রাম তৈরি করুন । ছবছ একই প্রশ্নে দুবার ষড়গ্রাম তৈরি করবেন না । এতে জবাব ভুল হতে পারে ও আপনি বিভ্রান্ত হতে পারেন ।

চেতনা অতিচেতনা, নিরাময় ও প্রশান্তি আপনাকে নিয়ে যাবে চেনা জগতের বাইরের এক ভিন্ন ভুবনে। কৃষ্টাল বলের মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে লাভ করতে পারেন অতিচেতনা, আঙ্গুরের পরশেই আপনি নিরাময় করতে পারেন ব্যথা বেদনা, ৩টি মাত্র মুদ্রা ৬ বার নিক্ষেপ করলেই আইচিং-এ পেতে পারেন আপনার যে-কোনো প্রশ্নের নির্ভুল জবাব। আর শিথিলায়ন ও মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনি অবগাহন করতে পারেন প্রশান্তির মহাসাগরে।

